পুণ্যের আলো

(উপন্যাস)

শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

কলিকাতা

১৩২৬

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

মানসী প্রেস
১৪এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

স্বর্গীয় পিতৃচরণে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

বাবা!

আমি ক্ষুদ্র—আমার আশাও ক্ষুদ্র। কিন্তু ভরসা ছিল কেবল আপনার সঞ্চিত পুণ্যবল। আজ সেই পুণ্যবলেই আমার এই ক্ষুদ্র "পুণ্যের আলো"টুকু সাধারণের সমক্ষে ধরিতে সাহস করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন! আপনার আশীর্ব্বাদ দেবতার আশীর্ব্বাদের মত যেন আমার এই প্রবল বাসনার দ্বারে প্রতিষ্ঠা জাগাইয়া তোলে।

কানাই

নিবেদন

যাঁহার আদেশে চন্দ্র-সূর্য্য ওঠে, আকাশে নক্ষত্র ফুটে, পবন কুসুম-গন্ধ বহিয়া যাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা প্রচার করে, আজ তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া আমার এই "পুণ্যের-আলো"কে সাধারণের করে অর্পণ করিলাম। এখন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র 'পুণ্যের-আলো'টুকুকে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে স্থান দেন, তবেই আমার শ্রম সফল হইবে।

যাঁহার একান্ত আগ্রহ ও যত্নে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছি, সেই পরোপকারী, উদার, বাণী-মন্দিরের একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের নিকট আমি অশেষ ভাবে ঋণী—ইতি।

বাকুলিয়া গ্রাম
জেলা হুগলি
১৩২৬ বৈশাখী পূর্ণিমা।

বিনীত—
লেখক।

উপহার পৃষ্ঠা
কে

পুণ্যের আলো

[১]

হিম ঋতুর অবসানে বসন্তরাণী তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রকৃতির দরবারে পেশ করিতেছেন। মৃদু মধুর দক্ষিণের পবন শ্যামলা ধরণীর অঙ্গে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া, সমস্ত জগৎকে যেন একটা সুষুপ্তির কোল হইতে টানিয়া লইয়া, জাগ্রতের বুকে তুলিয়া দিতেছে। মুকুলিত আম্রকাননরাজি সালঙ্কারা সলজ্জ-বধূর মত অবনত মস্তকে যেন কাহার আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। বৃক্ষান্তরালে দোয়েল-শ্যামার কলকল ঝঙ্কারে, নব-উন্মেষিত প্রকৃতির বুক হইতে নিস্তব্ধতার রাশি একে একে সরাইয়া দিতেছে। পিকরাজ স্বরলহরীতে দিগন্ত মাতাইয়া, বিরহিনী বধূর বুকে একটা চঞ্চলতার মহাসমারোহ তুলিয়া, রহিয়া রহিয়া, কেবলই ডাকিতেছে।

পঙ্কজিনী অধরপ্রান্তে সমস্ত হাসিটুকু চাপিয়া কহিয়া ফেলিল, "পাখীটা বড় দুষ্টু।"

"কেন—অমন সুন্দর আওয়াজ।"

"ওই আওয়াজের কথাইত বলছি; সময় নেই অসময় নেই, কেবল চেঁচাবে।"

"ওর যা কাজ তাই ক'রছে।"

"তাতে যে কত বেচারীর প্রাণ যায়, তা কি ভাবছে ?"

"তোমার প্রাণটা বুঝি যেতে বসেচে ?"

"যাও আমি ব'কৃতে পারিনে, তুমি ভারি দুষ্টু। দে'খিগে ইন্দু কোথায় গেল।"

ইন্দু তখন প্রাঙ্গণে একটী প্রজাপতির পেছু পেছু ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। "ইন্দু! এই সারা-রোদটা মাথায় ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্! তোকে যে একটু ঘুমুতে ব'ল্লাম।"

ইন্দুর তখন বড় ভয় হইয়াছে, জননীর দিকে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া বলিল,—"আমি ত ঘুমুতে যাচ্ছিলাম, ও বাড়ীর শিশিরদা আজ বাড়ী এলেন, তিনিইত আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন যে, আয় ইন্দু আমাদের বাড়ী আয়। মা তুমি আমায় মের না। এই দে'খ মা, শিশিরদা আমায় কেমন পুতুল দিয়েছেন।"

জননী কন্যাকে বুকে জড়াইয়া, স্নেহ-বিজড়িত স্বরে বলিলেন, —"ওমা মাথার চুলগুলোয় এত ধূলো মাখিয়েছিস! চল্ তোর চুলগুলো বেঁধে দিইগে।"

ইন্দুর মুখে এতক্ষণ হাসি ছিল না, একটা ভীতির আশঙ্কায় মুখখানি তাহার মলিন হইয়া উঠিয়াছিল। মায়ের বুকে উঠিয়াই, সে মলিনতা যেন কোথায় মিশিয়া গেল। প্রফুল্লতায় তাহার মুখখানি পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি হইয়া উঠিল। তখন গালভরা হাসি হাসিয়া বলিল,—"মা আমার বড্ড ভয় হ'য়েছিল—হয়ত তুমি মারবে। চ'ল না মা, বাবার কাছে যাই।"

যতীনবাবু বিছানাটার উপর—একখানি সংবাদপত্র বুকে করিয়া, একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইন্দু আসিয়া অতি ধীরে ধীরে পিতার পদতলে হাত বুলাইতে লাগিল। নিদ্রাভঙ্গ হইবা-মাত্র ইন্দুকে দেখিয়া স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন,—"ইন্দু, তুই কখন্ এলি ?"

"আমি অনেকক্ষণ এসেছি বাবা। দেখ বাবা—শিশিরদা আমায় কেমন একটা পুতুল দিয়েছেন।"

"কই দেখি মা," বলিয়া পিতা কন্যাকে সাদরে টানিয়া লইলেন। "বাঃ, বেশ সুন্দর পুতুল, তোর শিশিরদাদা কখন্ বাড়ী এল ?"

"অনেকক্ষণ।—শিশিরদা আমায় আরও পুতুল দেবেন বলেছেন।"

ইন্দু পুতুলটী লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্তে পড়িয়াছে,—তাহাকে কোথায় রাখিবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। পিতার কোল হইতে লাফাইয়া, তাহার পুতুলের বাক্সটী লইয়া সাজাইতে বসিল।

পঙ্কজিনী একডিস্ খাবার, এক গেলাস জল, ডিবাভর্ত্তি পান লইয়া স্বামীর সম্মুখে হাজির হইলেন।

"এই একরাশ খাবার কে খাবে, আয় ইন্দু খাবি আয়।"

"ওই একটু খাবার, ও তুমিই খেয়ে ফেল। বাড়ী এসে ক্ষিদে তেষ্টা সব কোথায় গেল ?"

"সত্যিই পঙ্কজ ! আমার মোটেই ক্ষিদে পায় নি।"

"আচ্ছা ক্ষিদে না পাক্, ওই একটু খাবার তুমি খুব খেয়ে ফেল্‌তে পার্‌বে।" বলিতে বলিতেই একখানা আরসী, কতকগুলা চুলদড়ি ও চিরুণী লইয়া, পঙ্কজিনী "আয় ইন্দু তোর চুলগুলো বেঁধে দিই" বলিয়া কন্যাকে টানিয়া দর্পণের সম্মুখে বসাইলেন। চুল বাঁধা ব্যাপার অনেকক্ষণের কাজ, অতক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া থাকা ইন্দুর পক্ষে অসম্ভব। সে অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র আবেদনগুলি জননীর কর্ণে পৌঁছাইল না। পঙ্কজিনী কন্যার ধূলোমাখা, একপিঠ্-কালোচুলের রাশি অনেক পরিশ্রমে পরিষ্কার করিয়া সযত্নে একখানি সুন্দর খোঁপা গড়িয়া, বেশ করিয়া মাজিয়া, ঘসিয়া, তাহাকে একখানি প্রতিমা করিয়া তুলিলেন।

দর্পণে কন্যার প্রতিবিম্ব বড় সুন্দর মানাইতেছিল। পশ্চাৎ হইতে যতীনবাবু তাহাই দেখিতেছিলেন, অস্ফুট স্বরে বলিয়া ফেলিলেন,—"মা যেন আমার লক্ষ্মী।"

পঙ্কজিনী ঘাড় বাঁকাইয়া একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি আবার কখন এসে দাঁড়ালে? এই নাও তোমার লক্ষ্মী, আমি এখন অন্য কাজে যাই।"

ইন্দু বায়না ধরিল, "মা! আমি একবার বেড়িয়ে আসি।"

"না—বেড়াতে যাস্‌নে, এই একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছি; এখনি আর ধুলোয় গা ভর্ত্তি করিস্‌নে।"

ইন্দুর মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। সে একবার কাতর নয়নে পিতার দিকে চাহিল। সে চাহনির যে কি অর্থ—পিতা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কন্যাকে অনুমতি দিলেন,—"যা ইন্দু, তুই বেড়াতে যা।"

জননীর কঠোর আদেশের উপর পিতার এই করুণ বিচারে ইন্দুর সরল সুন্দর মুখখানি, হাসির রাশিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখন আর তাহা কোন বাধা না মানিয়া, অধর-প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল। বড় মধুর, বড় সুন্দর হাসি হাসিয়া, ইন্দু এক দৌড়ে সেস্থান হইতে পলাইল।

যতীনবাবু স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া, একটু হাসিলেন। সে হাসির সমস্তটাই যেন বিদ্রূপ-মাখানো,—পঙ্কজিনীর গায়ে বড় বাজিল। তাই গলায় কাপড় দিয়া, ঢিপ্ করিয়া স্বামীর চরণে একটা প্রণাম করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন। বড় প্রেমমাখা স্বরে "ওগো, আমি কি তোমার উপর চাল্ চাল্‌তে পারি"—বলিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

যতীন বাবুর মুখে বাক্য সরিল না, গর্ব্বে তাঁহার বুকখানা ফুলিয়া উঠিল। আনন্দাশ্রুতে চক্ষু দুইটী ভরিয়া উঠিল; বুক্ত করে সেই প্রেমময়ের চরণে মস্তক অবনত করিতেই দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রাণভরা আবেগের সহিত বলিয়া ফেলিলেন,—"গর্ব্বের জিনিস এমন স্ত্রী, এমন মেয়ে ক'জনের আছে।"

রাইপুরের চাটুয্যে গোষ্ঠীর একটা পসার-প্রতিপত্তি বহুদিন হইতেই বেশ সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। তাহার উপর জীবন চাটুয্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া, পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত মিশাইয়া আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে প্রকৃত শান্তিটুকু দেন নাই; ক্রমান্বয়ে তিনটী সংসার করিয়াও, তিনি বজায় রাখিতে পারেন নাই। বারবার তিনবারে অকৃতকার্য্য হইয়া এবারে তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু মেজাজটা বড় খিটখিটে হইয়াছে, বিনাকারণে কোন কার্য্যের ত্রুটী না দেখিয়াই, বেচারা চাকর-চাকরাণীদের উপর বড় গরম হইয়া উঠিতেন। রতন নাপিতের ছেলে, সে বহুদিন হইতে বাবুর সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহার মেজাজটা বেশ হজম করিয়া ফেলিয়াছে।

বেলা অপরাহ্ণ; দিনমণি তাঁহার সুবর্ণ কিরণগুলি পশ্চিমগগন-প্রান্তে ছড়াইয়া, লুকোচুরি খেলিতেছেন। জীবনবাবু তাঁহার বৈঠকখানা গৃহের একপার্শ্বে একখানি আরাম-কেদারায় পড়িয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

নীরদা বাটীর ঝি, এক ঠোঙ্গা খাবার হাতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বাবুকে দেখিয়া সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া অপেক্ষাকৃত ধীর মন্থর গতিতে গমন করিতে লাগিল। কর্ত্তা আরাম-

কেদারা হইতে দেহখানি একটু তুলিয়া জলদগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন,—"নীরদা"—

ডাক শুনিয়াই, নীরদার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, হাতের খাবারগুলা পড়িবার উপক্রম হইল, গলার স্বর যেন বন্ধ হইয়া আসিল; তথাপি সে সাহসের সহিত বলিল,—"কি বাবু?"

কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"ন্যাকা মাগী, তোকে না পান দিয়ে যেতে বল্লাম, কথা বুঝি গ্রাহ্য হ'ল না?—সব বেটীদের আজ দূর ক'রে দেব।"

নীরদা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না, আজ সমস্ত দিনের মধ্যে যে তাহাকে কোন আদেশ করিয়াছেন, তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না; তাহা ছাড়া পান দিবার জন্য ত আদৌ বলেন নাই। সে হতভম্ভ হইয়া মৌনভাবে রহিল। তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল,—অধিকতর উত্তেজিত স্বরে,—"বটে এতদূর স্পর্দ্ধা, কথায় জবাব দেওয়া হ'ল না"—বলিয়া কর্ত্তা উঠিয়া বসিলেন।

নীরদা কাঁপিতে কাঁপিতে, অতি বিনীত স্বরে বলিল,—"আমায় কেন মিছামিছি বক্‌চেন, পান দেবার জন্য ত আমায় বলেন নাই।"

উত্তরোত্তর ক্রোধের মাত্রা বেশী হওয়ায়, বিকট স্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"আমার মুখের সাম্‌নে মিথ্যে কথা!—চলে যা বেটী, দূর্ হ"—বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

রতন পাশের ঘরে কি একটা কাজ করিতেছিল, কর্ত্তার বিকট

আওয়াজে বেগতিক বুঝিয়া, ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির হইল। সেই অবসরে নীরদা পরিত্রাণ পাইল। রতনকে দেখিয়া একটু শান্তস্বরে বলিলেন,—"ওরে রতনা, আর ত এ বাড়ীতে বাস করা চলে না।"

"কেন বাবু?"

"আজ ওই ঝী মাগীটার কাণ্ড দেখে ত আমি অবাক্ হ'য়ে গেছি! সেই কখন ওকে পান দিয়ে যেতে বলেছিলাম, তা এ পর্য্যন্ত"—বাধা দিয়া রতন বলিল,—"এই যে বাবু, অনেক পান রয়েছে।"

"আরে,—কি আপদ, তাকি আমি জানি; ওই ন্যাকা মাগীই হয়ত কখন রেখে গেছে—তা আমায় বলে যেতে হয়।"

রতন গোপনে মৃদু মৃদু হাসিল। তাহার কারণ, কর্ত্তার পুত্রবধূ আহারের পর ডিবা ভর্ত্তি করিয়া পান দিয়াছিলেন, যেমন পান তেমনিই রহিয়াছে, তাহা হইতে অতি অল্পই খরচ হইয়াছে। বেচারা নীরদা কেবল অনর্থক বকুনি খাইল! এরকম উপরি পাওনা এ সংসারে অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাহাতে বড় কেহ কিছু মনে করে না।

রতন, বাবুর মেজাজটাকে একটু পরিষ্কার করিবার জন্য, কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি একটা আলমারীর দিকে অগ্রসর হইল।

"আলমারী খুলচিস্ কেনরে রতন?"

রতন উত্তর করিল, "আপনার মাথার চুলগুলো অনেক সাদা হ'য়ে যাচ্ছে, তাই একটু কলপ লাগাব ব'লে কলপের শিশিটা আর

আয়নাখানা বের ক'রছি।" মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যেখানে একখানা প্রকাণ্ড কালোমেঘ ও প্রবল ঝড় উঠিয়া প্রলয়ের সূচনা করিয়াছিল, রতন যেন কি যাদুবলে নিমেষে সেগুলি সরাইয়া, সেখানে শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নার হাসি ফুটাইয়া দিল।

জীবনবাবু অধরপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন, —"রতন! এমন যত্নটুকু বুঝি, আর কেউ করে না, যতটা তুই করিস্; দে বাবা চুলগুলোয় কলপ লাগিয়ে। এই যে চুল-গুলো সাদা হ'য়ে যাচ্ছে, সেদিকে কি কারুর নজর আছে।"

নীরদা মুখখানা বড় মলিন করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সুরবালা, অনেকক্ষণ নীরদাকে খাবার আনিতে দিয়াছে; তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল—কিন্তু তাহার মুখখানা দেখিয়াই সে বিরক্তির ভাব কোথায় মিশিয়া গেল; বড় আর্ত্তিপূর্ণস্বরে সুরবালা বলিল "তোর মুখখানা এত শুকিয়ে উঠেছে কেন নীরদা?" এই স্নেহকরুণ স্বরে নীরদা একবারে গলিয়া গেল, ভাঙ্গা গলায় ক্রন্দনের সুরে উত্তর করিল, "দেখনা মা! বিনে-অপরাধে বাবু একবারে অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে আমাকে কত অপমান ক'ল্লেন!—দূর হ,—বেরিয়ে যা, যেন শেয়াল কুকুর!"

"কেন—কিসের জন্যে বক্‌লেন?"

"আমাকে কখন্ পান দেবার জন্য বলেছিলেন, আমি তাই দিই নি।"

"ওমা,—তুই আবার ওঁকে কখন পান দিস্, পান ত আমিই

দিই।—যা, কিছু মনে করিস্‌নে, বাবার কথা ধরিস্‌নে। এই—নে, তোর মেয়েকে জল খেতে দিস্"—বলিয়া ক্যাসবাক্স হইতে একটী সিকি বাহির করিয়া নীরদার হাতে গুঁজিয়া দিল।

নীরদার মুখখানা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, অল্প হাসি হাসিয়া,—"তোমাদেরই ত খাচ্ছি বৌমা" বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

দিনের আলো মাথায় করিয়া ইন্দু সেই কখন এ বাড়ীতে আসিয়াছে, ক্রমে রজনীর অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরণীর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল; এখনও সে বাটী যায় নাই। পঙ্কজিনী রন্ধন করিতেছিলেন, অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া স্বামীকে জানাইলেন,—"ও গো একবার দে'খনা, মেয়েটা কোথায় গেল।"

"তার জন্যে উতলা হ'য়ে দেখ' যেন, আজ রাতের দফায় মাটী কোরো না।"

"তখন না হয় আমায় জরিমানা কোরো।"

"জরিমানা কোত্থেকে দেবে?"

"যে জরিমানা কর্‌বে, সেই দেবে।"

"আর সে যদি না দেয়?"

"তখন না হয় জরিমানার দায়ে একজনার পায়ে বিকিয়ে যাব। এখন একবার মেয়েটাকে দেখে নিয়ে এস।"

"আচ্ছা—এই তামাকটা খেয়ে যাচ্ছি"। স্বামীস্ত্রীতে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ইন্দু তখন ওবাড়ীতে সুরবালার সজ্জিত একখানি খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া, শিশিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিস্মিত স্বরে শিশির বলিল,—"ইন্দু, তুই এখনও বাড়ী যাস্‌নি?"

"তোমার ত বেশ আক্কেল, ও একলা কি ক'রে যাবে? তুমি বুঝি ওকে একলা ছেড়ে দিতে চাও।"

"কেন—বৌদি'! নীরদাকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত হত।"

"কেন তুমিই বা সঙ্গে ক'রে দিয়ে এলে? ও একটু চায় তোমার সঙ্গে থাক্‌তে; সেটুকুও কি তুমি দিতে পার না?" বলিয়া সুরবালা একটু হাসিয়া সরিয়া গেল।

শিশিরের মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। ভবিষ্যতের একটা দায়িত্বপূর্ণ ছবির কল্পনা করিতে করিতে, একবার ইন্দুর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পবিত্রতা-মাখা কুসুমের মত, তাহা কি নিষ্কলঙ্ক—কি সুন্দর!

নয় বৎসরের বালিকা ইন্দু এ সব ব্যাপারের কিছুই বুঝিল না,—সে বড় মধুর স্বরে বলিল, "চল না দাদা, আমায় বাড়ী দিয়ে আস্‌বে—নইলে মা আমায় মার্‌বে।"

"চল যাচ্ছি।"

"তুমি ত বেশ! ও বুঝি শুধু মুখটীতে যাবে? আয় ইন্দু, খাবার খাবি আয়।"

"না আমি কিছু খা'ব না বৌদি'।"

"এখন থেকেই কি তোর কথা শুন্‌তে হবে," বলিয়া সুরুবালা তাহার গাল দুটা টিপিয়া দিয়া খুব হাসিল।

"বৌদি' ! তুমি আমায় মার্‌লে ?"

"হ্যাঁ, খাবার না খেলে আরও মার্‌ব"—বলিয়া শাসাইয়া ইন্দুর মুখে জোর করিয়া কতকগুলা খাবার গুঁজিয়া দিল। ইন্দু বড় বিপদে পড়িয়া সেগুলি অতিকষ্টে গলার নীচে নামাইয়া দিল। তখন শিশির জলযোগ শেষ করিয়া ইন্দুর হাত ধরিয়া তাহাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল।

যাবার সময় সুরবালা বলিয়া দিল, "কাল যেন আসিস্‌ ইন্দু।"

"আস্‌বো বৌদি'।"

[৩]

রতন তখন হইতে বাবুর চুলে কলপ মাখাইতেছে, বৈঠক-খানা-গৃহের সম্মুখে আসিয়া—"ইন্দু একটু দাঁড়া, আমি শিগ্‌গীর আসছি,"—বলিয়া শিশির ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—তাহার পিতা জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়াও বিধাতার নিয়মের বিরুদ্ধে স্বভাবের সৌন্দর্য্য বজায় রাখিবার জন্য চুলে কলপ মাখাইতেছেন—হায়! একি বাতুলতা, একি উন্মাদ-কল্পনা!

জীবনবাবু তন্দ্রাবশে একটু ঝিমাইতেছিলেন, রতন পেছন ফিরিয়া তাহার কার্য্য করিতেছে। শিশির ভাবিল, এ সময় আর বিরক্ত করিব না, আহারের সময় সাক্ষাৎ করিব। ঘরের আলো হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল, কিছুই তাহার নজর হইতেছিল না। ইন্দু খপ্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিল। তার পর তাহার সেই সুপরিচিত পথটার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

এইটুকু ক্ষুদ্রমেয়ে ইন্দুর কাছে শিশির যেন এতটুকু হইয়া গেল। আঁধারের পথে আলোর মত ইন্দু তাহাকে পথ দেখাইয়া তাহাদের বাটীতে লইয়া গেল।

পঙ্কজিনী সেই কখন্ মেয়েটাকে খুঁজিবার জন্য স্বামীকে বলিয়াছেন, যতীনবাবু কেবলই ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। পঙ্কজিনী এবার কিন্তু ভারি রাগিয়াছিলেন। ঠিক তখনই ইন্দু রান্নাঘরে

ছুটিয়া গিয়া জননীকে জানাইল,—"ঐ দেখ মা শিশির দা'—এয়েছেন।"

একটা ভক্তির মহিমায় পঙ্কজিনীর চরণপ্রান্তে শিশিরের মাথাটা যেন আপনা হইতেই লুটাইয়া পড়িল,—একটা অতীতের ছবি যেন সজীব হইয়া তাহার স্মৃতির দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বড় ভক্তিপূর্ণস্বরে শিশির ডাকিল, "কাকীমা!" পঙ্কজিনী স্নেহমাখা-হস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, আশীর্ব্বাদ করি—রাজা হও।"

"কাকা, আপনি কেমন আছেন"—বলিয়া শিশির সসম্ভ্রমে যতীনবাবুর চরণ সমীপে মস্তক অবনত করিল। যুক্ত করে মুদিত নেত্রে বিধাতার চরণপ্রান্তে একবিন্দু করুণার জন্য তিনি জানাইলেন।

পঙ্কজিনী গোটাকতক সন্দেশ, একবাটী দুধ লইয়া শিশিরের মুখের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—"এইটুকু খেয়ে ফেল শিশির।"

"কাকীমা, এই আমি খেয়ে আস্‌ছি।"

"তা হোক্, এযে আমি তোমারই জন্যে তৈরী ক'রেছি।"

"আমার জন্যে তৈরী ক'রলে কি আর কাউকে খেতে নেই?"

বড় স্নেহমাখা স্বরে পঙ্কজিনী উত্তর করিলেন "না বাবা, এটুকু তোমাকে খেতেই হবে; তা না হলে আমার ভারী কষ্ট হবে।"

"তবে দাও কাকীমা, শীগ্‌গীর দাও, খেয়ে ফেলি। কাকীমা!—তোমার এই অফুরন্ত স্নেহের ভেতর হ'তে যেন কখনও সরিয়ে দিও না, তাহ'লে আর বাঁচ্‌ব না!—সে অনেক দিনের কথা,

মা আমাদের বড় নিরাশ্রয় ক'রে চলে গেছেন; কিন্তু একটী জিনিস তোমার কাছে জমা রেখে গেছেন—'মায়ের ব্যাথা'! তাই সেই জমার খাতায় উশুল দিয়ে একটু হাল্‌কা ক'রে নিই।"

শিশির আত্মসংবরণ করিতে পারিল না,—অন্তঃস্থল হইতে একটা প্রবল বন্যার প্রবাহ ছুটিয়া আসিয়া, চোখ ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

একটা পবিত্র মহিমায় পঙ্কজিনী শিশিরকে বুকে তুলিয়া লইলেন; নয়নের অশ্রু স্নেহের কটাহে গলিয়া টস্ টস্ করিয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল।

যতীনবাবু করযোড়ে উর্দ্ধে চাহিয়া ডাকিলেন, "ভগবান্ কোথা হ'তে এমন পবিত্র জিনিস-দু'টী এ দীনের কুটীরে পাঠিয়ে দিয়েছ —মা, আর মেয়ে? তুমি দয়াময়!"

[৪]

"বৌমা কোথায় গা?" বলিয়া জীবনবাবু অন্দরে আসিয়া তাঁহার নিজের ঘরটায় গিয়া বসিলেন।

সুরবালা রান্নাঘরে কি একটা কাজ করিতেছিল, শ্বশুরের গলার আওয়াজ শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা আমায় ডাক্‌ছেন?"

"বৌমা—শুন্‌লাম, শিশির এসেছে; সে কোথায়?"

"ওবাড়ীর ইন্দু, আমাদের বাড়ীতে ছিল—সে একলা যেতে পার্‌বে না ব'লে তাকে সঙ্গে ক'রে তাদের বাড়ী দিতে গিয়েছে।"

"কেন? বাড়ীতে কি আর কোন লোক ছিল না—যে, তাই সে নিজে তার সঙ্গে গেছে?—না, এ সব আমার আর বেশ ভাল লাগে না বৌমা।"

সুরবালা শ্বশুরের মুখে একটা সন্দেহের ছায়া দেখিয়া, বেশ সরলভাবে বলিল,—"কেন বাবা—এতে আর দোষ কি?"

জীবনবাবু মুখখানা বিরক্ত করিয়া বলিলেন, "দোষ আছে বৈ কি বৌমা।"

"বাবা, ছোটবেলা হ'তে এ সংসারে এয়েছি, মায়ের মুখ কখন দেখিনি—কিন্তু আপনার স্নেহের আশ্রয়ে সে অভাব কখনও টের পাইনি—আপনিই আমাদের মা, বাবা, সব। তাই সময়ে সময়ে, বড় বেশী আব্দারের বোঝা আপনার ঘাড়ে ফেলি—

আপনিও তা হাসিমুখে সহ্য করেন,—তাই সাহস ক'রে ব'লছি —বুঝিয়ে দিন বাবা এতে কি দোষ ?"

"বৌমা তোর কথাগুলো বড় মিষ্টি, আমাকে একবারে গ'লিয়ে দিলি, সব ভুলে যাচ্ছি। না না, মনে হ'য়েছে—কেন বৌমা, তুমি কি সে দিন দীনু মোড়লের ব্যাপারটা শোননি ? ওই ওবাড়ীর যতীনটা আমার মুখের সাম্‌নে সে দিন কত কথা শুনিয়ে দিলে—যা' এ পর্য্যন্ত কেউ পারে নি ! আবার তাদেরই বাড়ীতে আজ শিশির সেই মেয়েটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে !— একি কম অন্যায়—এ ভারী দোষ।"

"বাবা, আমি সেদিনকার ব্যাপার সব শুনিছি। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আমাদের তেমন অভাব কিছুরই নাই—আর ওই দীনু মোড়ল বড় গরীব, অনেকগুলো ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করে, বড় কষ্টে তার দিন যায়।—তাই ওবাড়ীর কাকা সুদটা রেহাই দিয়ে তার জমীগুলো ছেড়ে দিতে ব'লেছিলেন—এর বেশী আর ত কিছু নয়।"

"আমি তাকে টাকা ধার দিয়েছি—সুদ ছেড়ে দিই না দিই, সে আমি বুঝবো। ওই যতীনটাত হাকিম নয় যে, সে বিচার, ক'রবে—আর আমি সেই হুকুমটা মাথায় ক'রে নেব! ঘরে এক সিকি পয়সা যার নেই—আজ চোখ বুজ্‌লে, কাল যা'র ছেলে মেয়েকে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'বে, সে আবার আমার মুখের ওপর কথা বলে—আমায় পরামর্শ দিতে আসে—আমার নিন্দে ক'রে !"

"কেন—বাবা, তিনি ত আপনাকে জোর ক'রে কিছু বলেন নি—নিন্দেও করেন নি—কেবল আপনার একটু দয়া চেয়েছিলেন।"

"ন—না, কেবল ও কথা নয়—আরও অনেক কথা—আর ওই কথাটাইত বড় শক্ত—ওরকম দয়া ক'রতে হ'লে যে দু'দিন পরে আমাকেও ওই দীনু মোড়ল হ'তে হবে। আর এসব দেনা-পাওনার ব্যাপারে ওর মাথা দেবার কি দরকার। এর ভেতর যতীনটা যদি না ঢুকৃত—তা হ'লে বোধ হয়—আমি দীনু মোড়লকে কিছু ছেড়ে দিতাম;—কিন্তু আর নয়, আর এক পয়সাও ছা'ড়ব না—যেমন ব্যাটা ওই যতীনটাকে মুরুব্বি ধরেছিল—তেমনি ও ব্যাটার ভিটেমাটী উচ্ছন্ন দেব আর যতীন-টাকেও একবার দেখে নেব!—ওর এত স্পর্দ্ধা! আমার মুখের ওপর কথা বলে—আমাকে আবার পরামর্শ দিতে আসে!—আমার একটা মুখের কথা শোনবার জন্যে কত লোক দিনরাত হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। সে আবার আমার ওপর চালাকী ক'ত্তে আসে! শোন বৌমা বলে দিচ্ছি—ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ্‌তে পাবে না,—ওদের বাড়ী যাওয়া আসা বন্ধ। আর শিশিরকেও ব'লে দিয়ো যে, আমি বারণ ক'রেছি—যেন ওদের বাড়ী না যায়;—আজকের মত আমি তাকে মাপ ক'ল্লাম।"

শিশির কখন আসিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতে-ছিল, পিতার এই কঠিন আদেশে তাহার কোমল, সরল হৃদয়ে বড় বাজিল।

তাহার কাকীমা,—এমন কাহার আছে?—যাঁহার হৃদয়ে নিভৃতে একটা নিথর শান্তি কেবল তাহারই জন্য লুকানো থাকে—যিনি বড় আদরে বড় যত্নে, তাহার হৃদয়ের ব্যথা সেই শান্তি-বারি ঢালিয়া ধুইয়া মুছিয়া দেন—কেমন করিয়া তাঁহার সঙ্গে দুটো কথা না কহিয়া থাকিবে? অন্যে যে পারে পারুক—সে কেমন করিয়া পারিবে? শিশির আর ভাবিতে পারিল না, যন্ত্রণায় তাহার সেই প্রশান্ত নয়ন-দুটী হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

ভীষণ ঝঞ্ঝার মুখে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর যেমন ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার হইয়া যায়, সুরবালার বুকের ভেতরটা তেমনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অতিকষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া বলিল,—"চলুন বাবা, এতক্ষণ বোধহয় খাবার তৈরী হ'য়েছে।"

কর্ত্তা হঠাৎ ঘরের বাহিরে শিশিরকে দেখিয়া বলিলেন—"কে ও শিশির! তুই কখন্ এখানে এয়েছিস?"

তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চোখটা মুছিয়া ভয়ার্ত্তস্বরে শিশির বলিল,—"এই একটু আগে এয়েছি।"

"তা হ'লে সব শুনেছিস্? আর এখনও ব'লে দিচ্ছি,—ও বাড়ীর যতীনটার সঙ্গে আর কথাবার্ত্তা ক'স্‌নে, আর ওদের বাড়ীতে যাস্‌নে।"

সুরবালা হাতের আলোটা একটু উঁচু করিয়া, শিশিরের মুখের দিকে তাকাইতেই, তাহার হৃদয়ের ছিন্নতারগুলো বড় বেসুরো বাজিয়া উঠিল। শিশিরের হাতটা ধরিয়া, "খাবে এস"

—বলিয়া লইয়া গেল। ভাতগুলা আর গলার নীচে নামিল না, একটা মর্ম্মান্তিক যাতনায় যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল ;—তুই চা'রবার নাড়াচাড়া করিয়াই শিশির উঠিয়া পড়িল। তাহার এই ভাবান্তর দেখিয়া, সুরবালার হৃদয় হইতে একটা অগ্নি-নিশ্বাস আপনা হইতেই বাহির হইয়া আপনা আপনি নিশীথের বায়ুতরঙ্গে মিশাইয়া গেল—আর কেহই জানিতে পারিল না।

[৩]

উষার আলো দেখিয়া পাখীগুলা সব ডাকিয়া উঠিল, বকুল ডালে বসিয়া একটা কোকিল নিজের কালোরূপ লুকাইয়া গলাবাজি আরম্ভ করিল। শয্যাত্যাগ করিয়া শিশির, বাহিরের বারান্দায় আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। সম্মুখে পরিষ্কৃত, সজ্জিত, নানাবিধ-কুসুম-শোভিত উদ্যান যেন আপন সৌন্দর্য্যে আপনি ফাটিয়া পড়িতেছে—বসন্ত সমীরণ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভ লুটিয়া, দিকে দিকে বিলাইয়া বেড়াইতেছে। মৌমাছির দল, বকুল ফুলে বসিয়া গুন্‌গুন্‌ রবে এক অপূর্ব্ব সুরের সমাবেশ করিয়াছে—মাঝে মাঝে ভ্রমর আসিয়া তাহার উপর ঝঙ্কার দিতেছে। সুখময়ী উষার এই শান্তিদায়িনী মূর্ত্তিও শিশিরের প্রাণে শান্তি আনিতে পারিল না। সারারাত্রির অনিদ্রায় তাহার চোখ দুটা বড় লাল—মুখখানা শুক্‌নো, চোখের কোণ দুটো বসিয়া গিয়াছে। শিশির বারান্দার রেলিং ধরিয়া, উদাসনেত্রে ওই ইন্দুদের বাড়ীটার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। ক্রমে প্রভাত রবির কিরণরশ্মি তাহার মুখে পতিত হইল। সেখান হইতে একটু সরিয়া রেলিং ধরিয়া বড় অলসভাবে নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। নিম্নে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র দেখিল—একটি গোলাপের ডাল ধরিয়া ইন্দু ফুল তুলিতেছে, তাহার হাতে একটা ফুলের সাজি। কিছুক্ষণ ধরিয়া অনিমেষ নয়নে তাহাকে দেখিল

—কি সে সরল সুন্দর মূর্ত্তি! ইন্দুর সঙ্গে দুটো কথা না কহিয়া, শিশির আর থাকিতে পারিল না—একটু এদিক ওদিক চাহিয়া, অতি ধীরে ধীরে শিশির ডাকিল,—"ইন্দু, কি ক'চ্ছিস্" ।

শিশিরের গলার আওয়াজে চারিদিক চাহিয়া, ইন্দু বারান্দার দিকে তাকাইয়া তাহাকে দেখিতে পাইল। ফুলের হাসির সহিত তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া ইন্দু বলিল,—"মা পূজো ক'রবেন, তাই ফুল তুল্‌ছি দাদা।" ইন্দুর আর ফুলতোলা হইল না, ফুলের সাজিটা মাটিতে রাখিয়া, একটা ফুল হাতে করিয়া, শিশিরের কাছে ছুটিয়া আসিল।

ভয়াকুল চিত্তে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া, শিশির তাহার কাণে কাণে বলিল,—"বেশী জোরে কথা ক'সনে ইন্দু।" সারল্যপূর্ণ চক্ষে শিশিরের পানে চাহিয়া ইন্দু বলিল,—

"কেন দাদা" ?

শিশির এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না, কেবল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ইন্দু একটু ভীত হইয়া, শিশিরের আরও নিকটস্থ হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দাদা তোমার মুখখানা অমন শুক্‌নো কেন? বলনা—কি হয়েছে তোমার?"

এই ছোট মেয়ে ইন্দুর দৃষ্টির সম্মুখেও যে তাহার এই মানসিক দুর্ব্বলতাটুকু গোপন করিতে পারে নাই,—ইহা ভাবিয়া শিশির বড় লজ্জিত হইল। তথাপি সে নিজেকে একটু সামলাইয়া, অতি ধীরে ধীরে বলিল,—"কই না, আমার ত কিছু হয় নি ইন্দু।"

"না—দাদা, তোমার যেন কি অসুখ হ'য়েছে!—আমায় তুমি বলছ না—আমি মাকে ব'লিগে।"

সরলা বালিকার এই স্নেহ-করুণ স্বরে শিশিরের ব্যথিত হৃদয় মথিত করিয়া তুলিল, আকুল আবেগে তাহাকে কোলের নিকট টানিয়া, বেদনাক্লিষ্ট স্বরে বলিল,—"না-না, ইন্দু আমার কিছু হয় নি,—তুই কাকীমাকে কিছু বলিস্‌নে"। জীবন বাবু চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে, শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া, বারান্দায় শিশির ও ইন্দুকে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়াই, তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তপ্ত অঙ্গারের মত মুখখানা লাল করিয়া, তীব্রস্বরে বলিলেন—"শিশির! তুই বড্ড বাড়িয়ে তুলেছিস্;—কিন্তু এটাও জানিস্ যে, আমার কথার অবাধ্য হওয়ার পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর।"

শ্বশুরের ক্রুদ্ধ আওয়াজে সুরবালা তাড়াতাড়ি গৃহমধ্য হইতে বাহিরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, অতি উদাস করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল,—"বাবা, আপনি রাগ্ কর্‌বেন না—চুপ ক'রুন, আমি বারণ ক'রে দিচ্ছি;—ইন্দু আর আমাদের বাড়ী আসবে না—আর ওদের সঙ্গে আমরা কেউ কথা ক'ব না।"

বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের মত শিশিরের দেহ এতক্ষণে মাটীতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অতি কষ্টে সে তাহার অসাড় অবসন্ন দেহখানিকে রেলিংটার উপর তুলিয়া, হেলান দিয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

আর আশঙ্কা-পাণ্ডুর ব্যথিতা ইন্দু, চঞ্চলপদে সুরবালার

নিকট আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,—"বৌদি'—শিশির দা'কে উনি ওরকম ক'রে কেন ব'কলেন ?"

ব্যথিতান্তঃকরণে ভগ্নস্বরে সুরবালা বলিল,—"তোর শিশির দাদা ওঁর কথা শোনে নি, তাই ব'কছিলেন।—আয় ইন্দু, আমরা নীচে যাই"—বলিয়া আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে ইন্দুকে বুকে লইয়া সুরবালা নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু কেমন করিয়া ইন্দুকে তাহাদের বাটী আসিতে নিষেধ করিবে, এই চিন্তায় তাহার সমস্ত শরীরের রক্তস্রোতের গতি যেন এক একবার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সুরবালা সনিশ্বাসে মনে মনে বলিল, "এত কঠিন হ'তে পা'রব না—তাতে বাবা, যা'ই মনে ক'রুন। নিশ্চল প্রস্তর-প্রতিমার মত সুরবালা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, আর তাহার উজ্জ্বল, সুনীল চক্ষু দু'টী হইতে ধারায় ধারায় মুক্তাবিন্দু ঝরিতে লাগিল। ইন্দু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে জড়াইয়া বলিল,—"বৌদি', আজ কি হ'য়েছে—তোমরা আমায় ব'লছ না কেন ? এমন ত একদিনও হয় নি,—শিশির দা'কে উনি ব'কলেন—তুমি কাঁদছ, তোমরা আর আগেকার মত তেমন হাঁস্‌ছ না কেন ? আমার বড্ড ভয় হ'চ্ছে।"

সুরবালা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, ইন্দুকে বুকে করিয়া অবেগ-পূর্ণ স্বরে বলিল—"ইন্দু, ছোট বোন্‌টী আমার"—নীরদা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদিমণি, বাবু নীচেয় নাম্‌ছেন।"

সুরবালা সশঙ্কিতে ইন্দুকে কোল হইতে নামাইয়া বলিল "যা—ইন্দু তুই বাড়ী যা,—আমাদের বাড়ী আসিস্‌নে।"

সরল স্নিগ্ধ চক্ষে ইন্দু একবার সুরবালার মুখের পানে চাহিয়া, চকিতে তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। অঞ্চলাগ্রে নয়ন আবৃত করিয়া সুরবালা নীরবে রোদন করিতে লাগিল। কি এক যন্ত্রণা, কি এক হাহাকার তাহার বুকের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। একটা ঘূর্ণবায়ু যেন একরাশি ধূলা উড়াইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার করিয়া দিল।

চঞ্চল লঘুভার শুভ্র একখণ্ড মেঘের মত, নীলাম্বরে অষ্টমীর দ্রুত অস্তগামী চন্দ্রলেখার মত, সেই গমনশীল বালিকা ইন্দুকে সতৃষ্ণ নয়নে শিশির বারান্দা হইতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ আকুল নয়নে দেখিল,—কি সে সৌন্দর্য্য—কি সে শোভা!

[৬]

একখানি গরদের কাপড় পরিয়া এলোচুলে পঙ্কজিনী শিব-পূজার জন্য, চন্দন ঘষিতেছিলেন। ইন্দু আসিয়া ডাকিল,—"মা—মাগো।" কন্যার এই ব্যথিত স্বরে স্নেহপরায়ণা জননী চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ইন্দু! কাঁদছিস্ কেন মা?"

বায়ুতাড়িত বর্ষার গোলাপের মত ইন্দুর কৃষ্ণতার চক্ষু-দু'টী হইতে কেবল ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না। আবেগ-উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে জননী কন্যাকে বুকে লইয়া স্নেহ-ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—"কি হ'য়েছে মা?"

মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া বড় নিরাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে ইন্দু বলিল "মা! ও বাড়ীর বৌদি' ব'ল্লে—ইন্দু আর আমাদের বাড়ী আসিস্‌নে। কেন মা—কেন আমায় ওরা যেতে বারণ ক'ল্লেন?"

"তুই, বুঝি, ওদের বাড়ী গিয়ে খুব দুষ্টুমি করিস্?"

"না মা, আমিত কিছু দুষ্টুমি করিনে—বৌদি', শিশিরদা', আমায় যা' বলেন, আমি তাই করি"—বলিয়া ইন্দু ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ওবাড়ীর নীরদা আসিয়া ডাকিল—"বৌঠাকরুণ কোথায় গা?"

"কে ও নীরদা! আয় এইখানে আয়"—বলিয়া রোদন-কাতরা

কন্যাকে বুকে লইয়া পঙ্কজিনী গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নীরদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হ্যাগা, বৌঠাক্রুণ! দাদাবাবু—সে দিন ও-বাড়ীর কত্তার সঙ্গে ঐ কি—দীনু-মোড়লের জন্যে ঝগড়া ক'রেছিলেন, শুনেছ গা?"

পঙ্কজিনী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কিসের ঝগড়া? আমি ত কিছু জানি নে!"

"ও-মা! তুমি শোন নি—সেই জন্যে এতকাণ্ড হ'য়ে গেল, আর তুমি এর কিচ্ছু জান না বৌঠাক্রুণ?"

"কেমন ক'রে জান্‌ব নীরদা?—আমরা মেয়ে মানুষ, ঘরের কাজ নিয়েই ব্যস্ত—ওসব বেটাছেলেদের কথায় কাণ দেবার সময় কখন?"

"তা'ত, বটেই বৌঠাক্রুণ, একলা মানুষ"—কথাটা একটু উল্টাইয়া নীরদা বলিল—"এই একবার তোমাদের বাড়ী এয়েছি, তা'তেই বুকটার ভেতর যেন ধড়াস ধড়াস্ ক'চ্ছে!—যাই মা।"

"কেন নীরদা? আমাদের বাড়ী আস্‌তে কি কেউ বারণ ক'রে দিয়েছে?"

নীরদা সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"ওমা, শুধু কি তাই?—দুটো মুখের কথা পর্য্যন্ত, ওবাড়ীর সম্পর্কে কেউ তোমাদের সঙ্গে কইতে পাবে না, যাওয়া আসা, কথাবার্ত্তা সব বন্ধ,—কত্তার এই হুকুম"। এক নিশ্বাসে কথাগুলো সব বলিয়া তাড়াতাড়ি নীরদা চলিয়া গেল।

পঙ্কজিনীর হিংসাশূন্য সরল ঔদার্য্যমাখা বদনমণ্ডল বড় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সংসারজ্ঞান-শূন্যা বালিকা জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া ভগ্নার্ত্তস্বরে বলিল—"মা! তোমার মুখখানা অমন হ'ল কেন মা? নীরদা অত কি ব'লে গেল?"

"ও কিছু নয় মা"—বলিয়া কন্যাকে একটু প্রফুল্লিত করিবার জন্য তাহার সেই স্বভাব-লোহিত গণ্ডদেশে একটী চুম্বন করিয়া নিজেও একটু শান্তি পাইলেন।

পঙ্কজিনী আজ শিশিরকে, নিজের কাছে বসাইয়া দু'টী খাওয়াইবার জন্য কাল সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাই বড় আনন্দে বড় উৎসাহে যতীনবাবু সেই প্রত্যূষে উঠিয়া কিছু ভাল জিনিস সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথা হইতে একটা মস্ত মাছ হাতে করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বাটী আসিয়া বলিলেন—"এই নাও, এই মাছ্‌টার মুড়ো দিয়ে বেশ ভাল ক'রে ঝোল রেঁধে শিশিরকে দিয়ো।"

পঙ্কজিনী বাষ্পাকুল লোচনে স্বামীর দিকে তাকাইয়া বেদনাক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন,—"শিশির কি আমাদের বাড়ী আসবে?"

বিস্মিত লোচনে যতীনবাবু অশ্রুমুখী পত্নীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সে—কি! তুমি কি বল্‌ছ,—আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছিনে!"

"তুমি যে ও-বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছ, তাই ওদের বাড়ীর কেউ আমাদের বাড়ী আস্‌বে না, আর আমাদের

সঙ্গে কথাও কবে না ; নীরদা এইমাত্র বলে গেল। আর ওবাড়ীর বৌমাও ইন্দুকে ব'লেছেন—আমাদের বাড়ী আসিস্‌নে।"

যতীনবাবু স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন "আমি ওঁর সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছি—কবে কি বিষয়ে—মনে হ'চ্ছেনাত ?"

"নীরদা ব'ল্লে কি দীনু মোড়লের জন্যে।"

"ও হো হো ! মনে হয়েছে,—দীনু মোড়লের জন্যে ত আমি ঝগড়া করিনি, আমাকেই তিনি যথেষ্ট অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে কথা শুন্‌লে তোমার কষ্ট হবে ব'লে এতদিন তোমায় গোপন ক'রে রেখেছিলাম পঙ্কজ ! আমরা গরীব—তাই গরীবের ব্যাথা বুকে বড় বাজে, তাদের হ'য়ে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌তে বড় ইচ্ছে ক'রে ; অতিরিক্ত সুদে আসল সামান্য মাত্র টাকা দিয়ে, দীনু মোড়লের সমস্ত বিষয়, ভিটেমাটী, উনি তা'র ঋণের দায়ে বিক্রী ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিলেন—দরিদ্র গরীব বেচারা একটু অনুনয় বিনয় ক'রে তাঁকে অনুরোধ ক'রবার জন্য আমায় ব'লেছিল। তা'র গভীর আর্ত্তনাদে বিচলিত হ'য়ে বড় আশায় একবিন্দু দয়া, একবিন্দু অনুগ্রহের জন্য, তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম ; কিন্তু বুকে একটা শক্ত পাথরের আঘাত খেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এসেছি ! তা'র চোখের জল মুছাতে পারি নি ! তীব্র অনুতাপানলে কেবল বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক হ'য়ে গিয়েছে, নিজেকে নিজে শত ধিক্কার দিয়েছি, আর ভগবান্‌কে জানিয়েছি যে, হে ভগবান্ ! তোমার রাজত্বে এত অবিচার কেন ? মানুষ হ'য়ে

মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এত কষ্ট দেয় কেন! পঙ্কজ! অপরাধ আমার—তাঁর পুকুর-ভর্ত্তি জল হ'তে তৃষ্ণার্ত্তের জন্য এক অঞ্জলি জল প্রার্থনা ক'রেছিলাম! তিনি তা' দিতে পারেন নি; বেশীর ভাগ যথেষ্ট অপমানিত ক'রে বিদায় দিয়েছেন! তা'তেও তাঁর প্রতিহিংসা মেটে নি, এ আবার একটা নূতন রকমের প্রতিশোধ! পঙ্কজ,—কোন আত্মীয়তা বা সম্বন্ধ ওবাড়ীর সঙ্গে আমাদের ছিল না;—কেবল ওবাড়ীর বৌমা—আর শিশির, এই দুজনায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা বড্ড বেশী বাড়িয়ে তুলেছিল! তা'র পিতা বোধ হয় সেটুকুও রাখ্‌তে চায় না? শিশিরের বাপ বড়লোক—আমরা গরীব; কিন্তু শিশিরকে তুমি বড় ভালবাসো, স্নেহ করো;—সে ভালবাসা—সে স্নেহ আর প্রকাশ ক'রো না, নীরবে তার মঙ্গলাকাঙ্খিনী হ'য়ে দিনগুলো কাটিয়ে দিও।" বড় যন্ত্রণায় পঙ্কজিনীর চক্ষু বাহিয়া, ঝলকে ঝলকে তপ্ত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। স্নেহ-ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ওগো সে যে বড় সরল, বড় কোমল! তা'রও যে বুকে এমনি বাজবে! কে তার ব্যাথা মুছিয়ে দেবে?" যতীন বাবু অশ্রু-ভারাকুল নেত্রে নতমুখে মৃদুস্বরে বলিলেন, "যে জগতের ব্যাথা মুছোয়!"

[৭]

সপ্তাহ অতীত হইল, এ কয়দিনের মধ্যে শিশির একবারও তাহার কাকীমার সহিত দেখা করিতে সাহস করে নাই। পিতার তীব্র তিরস্কারে তাহার সেই তরুণ হৃদয়ের পবিত্র ভক্তিভাব কি এক আশঙ্কায় হৃদয়ের এক কোণে জড়সড় হইয়া একটা বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিত,—তথাপি সে তাহার কাকীমার স্নেহের শীতল ছায়ায় একটু শান্তি উপভোগ করিতে সাহস করে নাই। শিশির বারান্দায় একখানি লৌহাসনে বসিয়া ভাবিতেছিল,—পিতার বুকে কি এতটুকুও স্নেহ নাই যে, তিনি তাহা হইতে একবিন্দু তাঁহার এই স্নেহহারা সন্তানকে দিতে পারেন? কখনও ত, তাঁর কাছে কিছু চাইনি, আজ একটা জিনিস প্রার্থনা করিব।

চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে অস্ফুট স্বরে বলিল "বাবার পায়ে ধরিয়া একবার মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিব,—দেখি, মাতৃহারা সন্তানের মুখে একটু হাসি দেখিবার জন্য তিনি একবিন্দু স্নেহ দিতে পারেন কি না?"

সুরবালা সান্ধ্যদীপ জ্বালিয়া, শিশিরের শয়ন-গৃহটা একটু পরিষ্কার করিবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু শিশিরের এই নিবিষ্ট চিন্তার মধ্যে বেদনার চাঞ্চল্যে আকৃষ্ট হইয়া মৌন প্রস্তর-প্রতিমার মত

মুগ্ধ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিল, অবসর পাইয়া অভিমান-জড়িত স্বরে বলিল—"ভুল বুঝেছ।"

চমকিতভাবে পশ্চাৎ ফিরিয়া আবেগ-উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে শিশির বলিল—"কেন বৌদি' ?"

"তুমি কি এত সরল—তুমি কি সংসার হ'তে এত দূরে থা'ক যে, এটুকুও বুঝ্‌তে পার না।"

"না—আমি ত বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে ?"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সুরবালা উত্তর করিল—"তবে শোনো। —প্রতিশোধ-স্পৃহার বিষে, বাবার বুকের সমস্ত স্নেহটুকু জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছে, দেবার মত আর কিছু নেই—সে বুকে আছে কেবল প্রতিশোধেরই রাজত্ব।"

"তবু একবার তাঁর পায়ে ধ'রে ভিক্ষে চাইব।"

"বৃথা আশা!—কেবলি একটা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা বুকে ক'রে নিরাশ প্রাণে ফিরে আস্‌তে হ'বে।"

"তবু একবার জোর ক'রে তাঁর পা'দুটো জড়িয়ে ধ'রব।"

"না, না, কিছু ফল হবে না,—আমি বাবার মেজাজ বেশ জানি। আত্মাভিমান-গর্ব্বিত পিতার হৃদয়ের বিদ্রোহ-পতাকার মূলে ওই নিরীহ নিরপরাধ প্রাণী-দু'টী দলিত হয়ে যাবে!"—অমঙ্গল-শঙ্কাকাতর প্রাণে একবার শিশিরের দিকে তাকাইয়া, বড় অবসন্ন হৃদয়ে সুরবালা বারান্দায় বসিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুইটী মুছিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হইতে একটা অস্ফুট রোদনধ্বনি শিশিরের কণ্ঠদেশে ঠেলাঠেলি করিতেছিল, অবসর পাইয়া

তাহা বাহির হইয়া পড়িল; সজল চক্ষে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তবে কি এখন কেবল এমনি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকব?"

অশ্রুমুখী সুরবালা নতমুখে জানাইল—"হ্যাঁ তাই"—

"তবে আজই আমি কল্‌কাতায় যাব?"

"সেও ভাল,—কখন যাবে?"

"ভোরের গাড়ীতে। আমার জিনিসপত্র গুলো সব গুছিয়ে দিয়ো বৌদি'?"

"সব জিনিস গোছানই আছে, কেবল বইগুলো তুমি গুছিয়ে দিয়ো।"

অস্থিরভাবে বারান্দায় পাদচারণা করিতে করিতে, শিশির বলিল,—"আজই যা'ব, একথাটা একবার বাবাকে ব'লবো?"

"তাতে আর দোষ কি।"

নীরদা আসিয়া সংবাদ দিল, "বৌমা, খাবার তৈরী হ'য়েছে, ছোটদাদাবাবুকে ডেকে দিন,—আর কর্ত্তা খেতে আস্‌ছেন।"

"চল্ যাচ্ছি"—বলিয়া সুরবালা তাড়াতাড়ি শিশিরকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

তখনও জীবনবাবু অন্দরে প্রবেশ করেন নাই। দালানে পাশাপাশি দুইখানি আসন পাতিয়া, সুরবালা শ্বশুর ও দেবরের আহারেরর জায়গা করিয়া দিল। রতনকে সঙ্গে লইয়া জীবন বাবু আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, খাবার দেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"ওরে রতনা, আলোটা ঐ খানে রেখে, তুই এক ক'লকে তামাক সেজে রাখগে।"

রতন প্রভুর আদেশ মাথায় করিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল। পিতাপুত্রে আহারে বসিলেন, সুরবালা একখানি ব্যজনী হস্তে শ্বশুরকে বাতাস করিতে লাগিল।

জীবনবাবু বেশ নিবিষ্ট মনে আহার করিতেছিলেন, কিন্তু শিশিরের মুখে যেন কোনটাই ভাল লাগিতেছিল না—এটা —সেটা কেবল নাড়াচাড়া করিয়াই রাখিয়া দিতেছিল—কোনটাই ইচ্ছাপূর্ব্বক আহার করিতেছিল না; কেবল নীরবে নতমুখে বসিয়া শিশির এইরূপ আহারের অভিনয় করিতেছিল। যদিও জীবনবাবুর সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না; কিন্তু সুরবালা তাহার এই ভাবান্তর সম্যক উপলব্ধি করিয়া, কোনরূপ জিদ্ না করিয়া মৌনভাবেই বসিয়াছিল,—আর একটা অভিমানে তাহার বুকের ভেতরটা কেবলই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

উদ্বিগ্ন হৃদয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে শিশির একবার তাহার বৌদিদির মুখের দিকে তাকাইল।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া সুরবালা তাহার মনোভাব জ্ঞাপন করিল।

আশঙ্কিত হৃদয়ে জড়িত স্বরে শিশির বলিল—"বাবা, আজ আমি ভোরের গাড়ীতে ক'লকাতায় যাব।"

গাম্ভীর্য্যমাখা স্বরে জীবন বাবু উত্তর করিলেন—"কেন?"

পিতার গম্ভীর আওয়াজে শিশির যেন কাঠের মত শক্ত হইয়া গেল।

"কিরে, চুপ ক'রে রইলি যে?—কথার জবাব দে" বলিয়া জীবনবাবু একবার মুখ তুলিয়া শিশিরের দিকে তাকাইলেন। শিশির একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ঈষৎ জড়িত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "পড়াশুনার ক্ষতি হ'চ্ছে।"

"কেন—বাড়ীতে বসে বুঝি আর পড়া শোনা হয় না?"

"অসুবিধা হয়।"

জীবন বাবু একটু থামিয়া বলিলেন—"হুঁ—তা' হ'লে আজই যাবি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"চাকরদের ব'লে রাখিস্ ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।"

শিশির নতমুখে নীরবে রহিল, কোন উত্তর করিল না।

"বৌমা, আঁচাবার জল কোথায় মা?"

"এই যে বাবা, এইখানে আছে"—বলিয়া সুরবালা জলের গাড়ুটা শ্বশুরের সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া একটা পিতলের হামানদিস্তায় গোটাকতক পান ছেঁচিয়া লইয়া শ্বশুরের শয়ন-কক্ষে গমন করিল।

আচমনান্তে তাম্বূল মুখে দিয়া রতনের সজ্জিত তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে জীবনবাবু অলসভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

সুরবালাকে তখনও দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতে দেখিয়া শ্বশুর বলিলেন—"যাও মা, খেয়ে দেয়ে শোওগে।"

শ্বশুরের আদেশ সূচক কণ্ঠস্বরে বধূ আর বাক্যব্যয় না করিয়া গৃহস্থিত আলো নির্ব্বাণ করিয়া ধীরপদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু মুখখানি অতি বিষণ্ণ—হৃদয়টা বড় উদাস। তাহার অন্তর তখন নিভৃতের কোমল তরুণ তন্ত্রীগুলিকে গভীর সমবেদনার সুরে মিশাইতে অতিশয় ব্যগ্র! শিশিরের সেই ম্লান বিষাদ-পরিপূর্ণ বদন-মণ্ডলে একটু হাসির রেখা ফুটাইতে প্রাণ বড় চঞ্চল! সুরবালা আহারে বসিয়াছিল, ভাল লাগিল না; অর্দ্ধভুক্ত আহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী ফেলিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। পশ্চাৎ হইতে নীরদা বলিল—"ওকি বৌমা, কিছু খেলে না মা,—সব পাতে প'ড়ে র'ইল।"

"শরীর বেশ ভাল নয়, তুইই খেয়ে ফেল্"—বলিয়া নীরদাকে বুঝাইয়া ত্রস্তপদে সোপান বাহিয়া, দ্বিতলে শিশিরের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও দ্বার উন্মুক্ত। বাসন্তী চন্দ্রিমার উজ্জ্বল আলোকে কক্ষ সম্পূর্ণ আলোকিত। সন্তর্পণে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, আপাদ-মস্তক একখানি শুভ্র চাদরে আবৃত করিয়া শিশির বিছানার উপর পড়িয়া আছে। কোন সাড়াশব্দ নাই, নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দমাত্রও নাই,—নিস্পন্দ আড়ষ্টভাবে বিছানায় পড়িয়া আছে। বহুক্ষণ স্থিরভাবে সুরবালা সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু শিশির তখনও তেমনি ভাবেই শয়ন করিয়া আছে; সুতরাং শিশিরকে নিদ্রিত ভাবিয়া সুরবালা কক্ষ হইতে বহির্গত হইবার সময় অস্ফুট স্বরে বলিল—"এখন ঘুমিয়েছে, যাবার সময় দেখা

ক'রব"। শিশির তখন প্রকৃত নিদ্রাভিভূত হয় নাই। একটা প্রবল চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যে নিমজ্জমান হইয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। বৌদিদির কণ্ঠস্বরে যেন একটা আশ্রয় পাইয়া ত্রস্তভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া বলিল,—"বৌদি', তুমি এখনও শোওনি?" চমকিত ভাবে চাহিয়া সুরবালা উত্তর করিল—"তবে কি তুমি ঘুমোওনি?"

"না অনেক চেষ্টা ক'রছি—কিন্তু ঘুম আস্‌ছে কই? একটা চিন্তা—"

"অনবরত চিন্তাতে ত বিশেষ ফল নেই।"

"না বৌদি'! এই চিন্তাতেই যেন আমি সুখী,—যতক্ষণ এই চিন্তা করি প্রাণে যেন শান্তি পাই।"

"এই চিন্তাতেই যদি সুখ ও শান্তি পাও, তাতে বাধা দিতে আমি ইচ্ছে করিনে। তবে তোমার মুখে আবার সেই পূর্ব্বের মত হাসি দেখ্‌তে পেলে, মনে একটু আনন্দ পাই।"

"বৌদি',—তুমিত সবই জানো, বাবা যে জোর ক'রে এই মাতৃহারা সন্তানের মুখের হাসিটুকু কেড়ে নিয়েছেন।"

"তা কি, আর কখনও ফিরিয়ে দেবেন না?"

"সেটা তাঁর ইচ্ছা।"

"কিন্তু আমি গর্ব্বভবে ব'লছি, বাবা যা' কেড়ে নিয়েছেন—আমি জোর ক'রে তা' আদায় ক'রব।"

উৎফুল্ল হৃদয়ে শিশির বলিয়া উঠিল—"পার্‌বে—বৌদি'?

"অনেকটা ভরসা করি। তোমার দাদাকে একখানা চিঠী

লিখে সমস্ত ব্যাপার জানাবো, বাবাকেও বেশ ক'রে বোঝাবো ; দেখি কতটা কৃতকার্য্য হ'তে পারি। কথায় কথায় অনেক রাত হ'য়ে গেল, এখন তুমি শোও। যাবার সময় একবার কাকীমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেয়ো, আর আমায় ডেকো ; আমি চল্লাম।"

শিশির আর কোন বাক্যব্যয় করিল না, অবসন্নভাবে শয্যায় শয়ন করিল। তাহার বিনিদ্র মুদিত চক্ষের উপর দিয়া কত অতীতের চিত্র ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উদ্ভূত স্নেহক্ষীর-ধারায় বর্দ্ধিত—তা'র পর ইহজীবনের জন্য জননীর স্নেহ-সুধায় বঞ্চিত হইয়া সেই আশ্রয়-হীন অবস্থায় তাহার কাকীমার অসীম স্নেহের ভাণ্ডারে আশ্রয় পাইয়া ক্রমশঃ তাহার স্নেহের শীতল ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার উপর আবার সেদিনকার সেই কত দিনের সঞ্চিত হৃদয়ভরা স্নেহ-করুণার মধুর স্মৃতি! তাহার সর্ব্বশরীর যেন কণ্টকিত করিয়া তুলিল! হর্ষ-বিষাদে তাহার চক্ষু আর্দ্র ও স্ফীত হইয়া উঠিল,—নিশ্বাস ফেলিয়া শিশির ভাবিতে লাগিল, 'কেন এমন হয়? নিজের প্রাধান্য সামান্য আহত হইলেই কি মানুষ তখন আঘাতকারীকে শতগুণে আঘাত করিতে চায়? যাহাকে প্রাণাধিক বলিয়া ভাবি, কই তাহার উপরও ত আঘাত করিতে সঙ্কোচ বোধ হয় না! অকপট অসীম স্নেহও যখন প্রতিশোধস্পৃহার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যায়, তখন জগতে বুঝি থাকে কেবল প্রতিশোধেরই রাজত্ব!' এইরূপ নানাবিধ

চিন্তাস্রোতে সে যেন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল! বিনিদ্র চক্ষেই তাহার প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। কক্ষস্থিত ঘড়ীতে তিনটা বাজিল, শিশির তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া আবশ্যক জিনিস পত্র ও পুস্তকগুলি একটী ব্যাগে গুছাইয়া লইয়া যাত্রার আয়োজন করিল। সুরবালা পূর্ব্ব হইতেই সজাগ ছিল, শিশিরের গমনের সময় হইয়াছে বুঝিয়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া শিশিরের শয়ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জননীসমা জ্যেষ্ঠাভ্রাতৃবধূর পদধূলি লইয়া শিশির বিদায় প্রার্থনা জানাইল। সুরবালা হস্তস্থিত সন্দেশের রেকাবী তাহার সম্মুখে ধরিয়া স্নেহ-বিগলিত স্বরে বলিল,—"এইটুকু খেয়ে যাও।" শিশির অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। সুরবালা জিদ্ করিয়া শিশিরকে খাওয়াইয়া বিদায়-প্রার্থনা মঞ্জুর করিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে গমনের অনুমতি দিতেই তাহার আয়তলোচন হইতে শিশির-বিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

শিশিরেরও সুনীল চক্ষু দুইটী অশ্রুভারে ফুলিয়া উঠিল! সে ইহার পূর্ব্বে কতবার বাটী আসিয়াছে, সুরবালাও তাহাকে কতবার বিদায় দিয়াছে; কিন্তু এমন ত কখনও হয় নাই। শিশির ভাবিল "এটা কি তবে মানসিক দুর্ব্বলতা?" সে আর অপেক্ষা না করিয়া ব্যাগ হস্তে সুরবালার মুখের দিকে একবার কাতর করুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে ববির্গত হইয়া গেল। সে কাতর করুণ চাহনির যে কি অর্থ ও তাহাতে যে কত বেদনা-

মিশ্রিত—সুরবালা তাহা বুঝিল। যতক্ষণ না দৃষ্টিপথের অন্তরাল হয়, স্থির ধীরভাবে সুরবালা সেইখানে দাঁড়াইয়া শিশিরকে দেখিতে লাগিল। শিশির ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিস্তৃত অট্টালিকার অংশ ও সজ্জিত পুষ্পোদ্যান ছাড়াইয়া, সুবৃহৎ ফটক পার হইয়া সদর রাস্তায় আসিয়া উপনীত হইল। তখন বাসন্তীচন্দ্রের অচঞ্চল জ্যোৎস্নার ধারায় পৃথিবী প্লাবিত,—বকুল,যূথি, জাতি ফুলের সৌরভবাহী দক্ষিণ পবন ফাল্গুন গীতে মুখরিত—প্রকৃতি যেন কি এক মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আবেশময় চাঞ্চল্যময়। শিশিরও যেন কি এক আকুল বাসনার সুখোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া আপনাতেই আপনি মগ্ন! কে যেন তাহার অজ্ঞাতে তাহাকে তাহার কাকীমার চরণতলে টানিয়া আনিয়াছে, ইন্দুদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আবেগকম্পিত হৃদয়ে শিশির দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত করিল।

বসন্তের অবসানোন্মুখ নিশীথে পঙ্কজিনী জাগরিত হইয়া স্বামীর সহিত শিশিরের সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, অকস্মাৎ দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যগ্রকণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন—"ওগো দেখ না গো, দরজায় কে শব্দ ক'চ্ছে। এ শব্দ যেন ঠিক তা'রই হাতের মত।"

যতীনবাবু চমকিতভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া বলিলেন,—"কৈ কে শব্দ ক'চ্ছে? সত্যি কি শিশির এয়েছে?"

"আমার বোধ হয়,—তুমি শীগ্‌গির দেখো।"

পুনরায় দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত হইল। যতীনবাবু শশব্যস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, সত্যই

শিশির একটী ব্যাগ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যতীন বাবুকে দেখিয়াই,ব্যাগ মাটীতে রাখিয়া শিশির সসম্ভ্রমে তাঁহার পদধূলি লইল। যতীন বাবুও অমনি ব্যাকুল আগ্রহে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"থাক্ থাক্,প্রণাম ক'রতে হবে না বাবা,—আশীর্ব্বাদ করি তুমি রাজা হও।" কিন্তু রাত্রে ব্যাগ হাতে ক'রে, কি ব্যাপার বল দেখি ?"

নতমুখে শিশির বলিল—"কলিকাতায় যাবো।"

স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎই পঙ্কজিনী বাহিরে আসিয়াছিলেন; শিশির এখনি কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া স্নেহ-ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"শিশির! কোন অসুখ হয়নি ত তোর ?"

"না কাকিমা।"

"তবে আজই যাবি কেন ?"—বলিয়া পঙ্কজিনী তাঁহার কোমল করুণ বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে নিজের বক্ষমধ্যে টানিয়া লইলেন। মাতৃহারা শিশির তাহার কাকীমার নির্ম্মল প্রশান্ত বক্ষে আশ্রয় পাইয়া প্রাণে যেন এক অননুভূত শান্তি পাইল। ভক্তিমিশ্রিত ভালবাসায় তাহার মন অভিভূত হইয়া উঠিল;—কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল নীরবে অশ্রুজলে তাহার কাকীমার বুক ভিজাইতে লাগিল। পঙ্কজিনী আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার সেই জ্যোতিঃপূর্ণ কৃষ্ণতার আয়ত চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি ছাপাইয়া উঠিয়া গণ্ডস্থল বাহিয়া মুক্তার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এমন সময়ে ইন্দু ছুটিয়া আসিয়া শিশিরকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"দাদা, আমায় আবার পুতুল এনে দেবে ? এই যে, তুমি

আবার আমাদের বাড়ী এয়েছ? তুমি আমাদের বাড়ী থাকবে শিশির দা'?"—বলিয়া কাতর নয়নে একবার শিশিরের দিকে তাকাইল। শিশির তাহার কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না, কেবল আদরে তাহার গণ্ডদেশে দুইটি আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দিল; ইন্দু তাহাতে হাসিয়া ফেলিল। সে হাসি বড় কোমল, বড় মৃদু। এতক্ষণে পঙ্কজিনী একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া দুই হাতে শিশিরের মুখ তুলিয়া ধরিয়া অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন,—"বাবা, আমরা অতি হীন দুর্ব্বল গরীব—তোমার বাবা, আমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুন,—কেবল তুই আর বৌমা, আমাদের পর ভাব্‌লে আমার বুক ফেটে যাবে।"

অশ্রুবিপ্লাবিত নয়নে পঙ্কজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া শিশির বলিল,—"মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তোমাকেই যে জানি কাকীমা?"

বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, রুদ্ধকণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিলেন,—"বাবা শিশির, তোর কথা শুনে সুখী হ'লাম। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন! তবে এমনি—এমনিভাবেই যেন তোর গরীব কাকীমাকে চিরদিন মনে রাখিস্।"

"কাকীমা, আশীর্ব্বাদ ক'র আর ভগবান্‌কে জানাও যেন, তোমার স্নেহের ছায়ায় চিরকাল এমনি ভাবেই মানুষ হই। গাড়ীর সময়ের আর দেরী নেই, যাই কাকীমা।"

তখন পঙ্কজিনী দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কপোলে

স্নেহাশ্রু বর্ষণ করিয়া মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,"বাবা তুমি সুখী হও"।

যতীনবাবু এতক্ষণ স্থির ধীরভাবে আনন্দাপ্লুত-হৃদয়ে এই অপূর্ব্ব পুণ্য-পবিত্র মিলনের অভিনয় দেখিতে দেখিতে আবেশে আত্মহারা হইয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—এর তুলনায় বুঝি ধনীর সম্পদ তুচ্ছ। সেখানে আছে কেবল—আত্মাভিমান, প্রতি-হিংসা, প্রতিশোধ; নিশ্বাসে গরল—তীব্র বিষ! এ শান্তি সেখানে কোথায়?

শিশির সেই স্নেহময়, পিতৃসম, উদার-হৃদয় মহাপুরুষের—পদধূলি লইয়া বলিল,—"কাকাবাবু,আর গাড়ীর বেশী সময় নেই—আমি যাই।"

যতীনবাবু যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, শিশির তাঁহার পদস্পর্শ করিতেই চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এখনি যাবি, তবে চল্ আমিও যাই—ব্যাগটা আমায় দে।"

"না,—কাকাবাবু, এ আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

"তোর কষ্ট হ'বে, আমায় দে।"

"না, এ সামান্য জিনিস; আমার কিছুই কষ্ট হবে না।"

তথাপি যতীনবাবু দুই তিনবার তাহার হাত হইতে ব্যাগটী লই-বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিশির কিছুতেই তাঁহাকে বহন করিতে দিল না; অগত্যা তিনি ক্ষান্ত হইলেন। উভয়ে কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই, ইন্দু ছুটিয়া আসিয়া শিশিরের হাত ধরিয়া বলিল,—"আবার শীগ্‌গির আস্‌বে শিশির দা'?"

শিশির স্বীকার করিল, শীঘ্র আসিবে। ইন্দু পুনরায় ছুটিয়া তাহার জননীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঙ্কজিনী নির্নিমেষ চক্ষে যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ তাকাইয়া শিশিরকে দেখিলেন। শেষে কন্যাকে কোলে লইয়া গৃহের ভিতর আসিলেন। তখন হৃদয় যেন বড় শূন্য—উদাস।

শিশির পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিল, আর গাড়ীর সময় বেশী নাই। তখন দ্রুতপদে উভয়ে রাস্তা হাঁটিতে লাগিল। অদূরে রেলওয়ে ষ্টেসন রাস্তা হইতে দেখা যাইতেছে, ক্রমে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন টিকিটের ঘণ্টা হইয়াছে—সকলেই টিকিট করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতেছে। কিন্তু টিকিট দিবে কে? টিকিট-মাষ্টার তখন সবে মাত্র নিদ্রা হইতে উঠিয়া চোখ-মুখে একটু জল দিয়া টিকিট ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। নিদ্রা ভঙ্গে অকস্মাৎ এতগুলি যাত্রী একসঙ্গে দেখিয়া, তাঁহার মেজাজটা কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছে; কাজেই তিনি সকলের সঙ্গে দেনা-পাওনার একটু গোলমাল করিতেছেন। অসহায় যাত্রীরা টিকিট পাইলেই সন্তুষ্ট, পয়সার দিকে তখন নজর বড় কম। শিশির অতি-কষ্টে একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট করিয়া প্ল্যাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমের যাত্রীবাহী বাষ্পীয় শকট হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে আসিয়া প্লাট্‌ফরম্ জোড়া করিয়া দাঁড়াইল। কুলীরা মাথায় মোট করিয়া ছুটাছুটী আরম্ভ করিল, ফেরীওয়ালারা 'পান বিড়ি সিগ্‌রেট' বলিয়া, জানালায় জানালায় হাঁকিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাত্রীরা এগাড়ী ওগাড়ী দেখিয়া, যে যেখানে সুবিধা পাইল

সেইখানেই উঠিল। সেদিন প্রত্যেক গাড়ীতে খুব ভিড়। তবে শিশির অপেক্ষাকৃত কম-ভিড় একখানি মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া,জানালায় মুখ বাড়াইয়া যতীনবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। দুই তিন মিনিট পরেই ষ্টেসন-মাষ্টার গাড়ী ছাড়িবার ইঙ্গিত করিলেন। তখন নিশা অবসানপ্রায়, সৌরভবাহী মৃদুমন্দ দক্ষিণ-পবন প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সৌরভরাশি বহিয়া বহিয়া উষার কোলে ঢালিয়া দিতেছে। গার্ড সাহেব নীল আলোকরশ্মি ঘুরাইয়া দিল, হুস্ হুস্ শব্দে ট্রেণ ছাড়িয়া চলিল। শিশির গাড়ী হইতে হাত তুলিয়া যতীনবাবুকে প্রণাম করিল ; নির্নিমেষে যতীনবাবু শিশিরকে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ছায়াবাজীর ন্যায় সমস্ত অপসৃত হইয়া গেল। ঘুমন্ত পল্লীর বক্ষের উপর দিয়া গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া ট্রেণ সবেগে ছুটিল।

[৮]

যতীনবাবু পশ্চিমে ডাক-বিভাগে একটি সামান্য বেতনের চাকরী করিতেন; সংসারে পত্নী কন্যা ছাড়া আর কেহই ছিল না। বিদেশে সামান্য বেতনে সপরিবারে বাসকরা অত্যন্ত কষ্টকর; তাহার উপর সংসারেও আর দ্বিতীয় লোক কেহ ছিল না। অগত্যা পত্নী-কন্যাকে দেশে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী বিদেশে থাকিতে হইত। সম্প্রতি এক মাসের ছুটী লইয়া বাটী আসিয়াছিলেন; ক্রমে ছুটী ফুরাইয়া আসিল, দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহাকে কর্ম্মস্থলে যাইতে হইবে,—ক্রমে সেই দুই দিনও পূর্ণ হইল। আজ ভোরের গাড়ীতেই তাঁহাকে রওনা হইতে হইবে। পঙ্কজিনী গৃহকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া, স্বামীর যাত্রার আয়োজন করিতেছেন,—পোর্টম্যাণ্টে সমস্ত কাপড় চোপড় গোছান—বিছানা-পত্র সব বাঁধা, এবং অন্যান্য আবশ্যক সমস্ত জিনিষই যথাস্থানে বেশ সুবন্দোবস্তভাবে রাখিয়া দিতেছেন—কন্যা ইন্দুও তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়াছে—যতীনবাবু আহারান্তে শয্যায় শুইয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে, সম্মুখে পত্নী ও কন্যার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কি আজ ঘুমুবে না?"

পঙ্কজিনী স্বামীর দিকে একবার প্রার্থনাপূর্ণ করুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ওগো, দে'খনা—সব জিনিস ঠিক করা হোলো কি না?"

যতীনবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমি যদি সবই বলে দেবো, তবে তোমার বাহাদুরী কি ?"

পঙ্কজিনী সপ্রেম-নয়নে স্বামীর দিকে তাকাইয়া গর্ব্বভরাকণ্ঠে বলিলেন,—"ওগো তোমায় আর ব'ল্‌তে হবে না, তোমার কোন্ জিনিস দরকার আমি সব জানি। তুমি কি আমার চেয়ে বেশী জানো ?"

"তবে জিজ্ঞাসা ক'রছিলে কেন ?"

"আমার অপরাধ হয়েছে, মাপ্ কর।"

"মাপ ক'র্‌তে পার্‌ব না, শাস্তি নিতে হ'বে।"

"রাজী আছি—কিন্তু শাস্তিটা, আমি বাছিয়া লইব"—বলিয়া স্বামীর চরণতলে মাথা রাখিয়া পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হাস্যোজ্জ্বল নয়নে স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"বুঝেছ ? এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন এইভাবেই দিনগুলো কাটে—শুধু দেবতার সেবা—আর কিছু নয়।"

যতীনবাবু কেবল মৌনমুগ্ধভাবে স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার মুখে তখন কোন বাক্য সরিল না। উৎফুল্ল হৃদয়ে ভাবিলেন, "পঙ্কজিনী সত্যই স্ত্রী-রত্ন ! দয়াময়, তোমার দয়া অসীম,—তাই এই দরিদ্রের কুটীরে এমন মহারত্ন পাঠিয়ে দিয়েছ।" ক্ষণপরে সনিশ্বাসে যতীন বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"তোমারই জিত।" পঙ্কজিনী একবার সরল হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"সে একশবার।" সে রাত্রিতে তাঁহাদের আর বড় নিদ্রা হইল না,প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে স্বামীস্ত্রীতে নানাবিধ সাংসারিক কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গে ও মাঝে মাঝে

ইন্দুর এক একটা বায়নায় একরূপ বিনিদ্রভাবেই রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে গমনের সময় উপস্থিত হইল; যতীনবাবু শয্যা ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া, যাত্রা করিয়া লইলেন। যাইবার সময় একবার ইন্দুকে বুকে লইয়া যাই যতীনবাবু—“তবে আসি মা ইন্দু” বলিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন, অমনি সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পঙ্কজিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, স্বামীর পদ-ধূলি মাথায় লইলেন। আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী সমস্ত মুটের মাথায় দিয়া যতীনবাবু রওনা হইলেন।

পঙ্কজিনী ম্লান মুখে একটা উদাস নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কন্যাকে বুকে লইয়া গৃহে আসিলেন।

ক্রমে ঊষারাণী আধ-আলো আধ-আঁধারময় গগনতলের উপরে ধীরে ধীরে সোণালি-পা ফেলিয়া ধরাবক্ষে নামিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে, পূর্ব্বাকাশ নবোদিত রবির তরল হেমোজ্জ্বলধারায় আলোকিত হইয়া উঠিল। জীবন্ত প্রভাতের বায়ুস্পর্শে শর্ব্বরীর নিদ্রিত প্রাণীগুলি যেন কি যাদুবলে নবো-দ্যমে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু পঙ্কজিনীর হৃদয় আজ বড় নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ। উৎসাহ-হীন প্রাণে সাংসারিক কার্য্যগুলি কোনক্রমে সমাপ্ত করিয়া, গাত্রমার্জ্জনী লইয়া কলসী-কক্ষে শঙ্কিত হৃদয়ে শিশিরদের উদ্যান-পার্শ্বস্থিত একটী সরোবরে স্নান করিবার জন্য গমন করিলেন। আশা—যদি একবার সুরবালার সহিত সাক্ষাৎ হয়। পুষ্করিণীর সোপান হইতে শিশিরদের দ্বিতলের কক্ষ বেশ নজর হয়; বহুক্ষণ তিনি আকুল নয়নে সেই উন্মুক্ত

গবাক্ষ-পথে আশান্বিত হৃদয়ে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রার্থিত বস্তু তাঁহার নয়ন-গোচর হইল না, অগত্যা তিনি ক্ষুণ্ণমনে নিরাশ হৃদয়ে কলসী পূর্ণ করিয়া সরোবর হইতে উঠিয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে শিশিরদের সেই গর্ব্বোন্নত শ্বেত অট্টালিকার দিকে কতবার তাকাইয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। মনে মনে ভাবিলেন, "বৌমার কোন অসুখ হয় নি ত? নতুবা এতক্ষণের মধ্যে একবারও কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না? বাসনা হইল—একবার ছুটিয়া গিয়া সুরবালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসেন; কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ ও আশঙ্কায় তাঁহার চলৎশক্তি যেন রহিত হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যাহার জন্য আজ এই সঙ্কোচ ও আশঙ্কা, যদি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হই—আর যদি তিনি অবজ্ঞাভরে কোন অবমাননা করেন—তবে সে যে বড় কষ্টকর—তাহাতে যে হৃদয়ের ক্ষত আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবে—তাহা অপেক্ষা এ অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা শতগুণে শ্রেয়ঃ। বোধ হয়—ভালই আছে।"

কোন রকমে তখনকার মত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত বেদনার কোন উপশম হইল না। অগত্যা তিনি চিন্তাক্লিষ্ট মনে গৃহে ফিরিলেন।

ইন্দু তখন একটী পুতুল লইয়া অপর একটী পুতুলের সহিত বিবাহ দিতেছিল—সম্মুখে জননীকে দেখিয়াই বলিয়া

উঠিল "মাগো—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দাওনা মা।"

পঙ্কজিনী কক্ষের কলসী ভূমিতে রাখিয়া স্নেহ-করুণ স্বরে বলিলেন,—"দিই মা?"

পরিধানের আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একখানি পরিষ্কৃত শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, তিনি কন্যাকে আহার্য্য সামগ্রী প্রদান করিলেন। ইন্দু তাহা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে পুতুল লইয়া আবার খেলা করিতে লাগিল। পঙ্কজিনী তখন নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিয়া আহ্নিকাদি সমাপনান্তে রন্ধনের আয়োজন করিয়া লইলেন। ক্রমে বেলা হইল। যথা সময়ে রন্ধনাদি শেষ করিয়া, কন্যাকে দুটী খাওয়াইয়া সেই পাত্রে নিজেও সামান্য আহার করিয়া লইলেন। এতক্ষণ এক রকমে কাটিয়া গেল; কিন্তু দিবসের অবশিষ্টাংশ ভাগ যে এখনও অনেক বাকী,—যে কয়দিন স্বামী গৃহে ছিলেন, সে কয়দিন তাঁহার সেবাতেই সমস্ত দিন বেশ অতিবাহিত হইত। দেবতার সেবায় আনন্দময় কর্ম্মের মধ্য দিয়া, অতীতের সুখময় দিনগুলি যেন চকিতের মত কি এক মিলনের স্রোতে মিশিয়া যাইত। কিন্তু আজ যেন মুহূর্ত্তগুলি বড় বিলম্বিত হইয়া সমস্ত দিনটাকে অত্যন্ত সুদীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছে;—তাই বুঝি, দিন আর কাটে না। কতক্ষণ এটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া, এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া পঙ্কজিনী গৃহাভ্যন্তরে সেলায়ের বাক্সটি লইয়া পশম-দ্বারা একখানি কার্পেটের উপর একটী কাকাতুয়ার ছবি বুনিবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন বড় অন্যমনস্ক, অত্যন্ত চঞ্চল। অমনোযোগিতায় হস্তস্থিত কার্য্য বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল না,—কেবল কোনরূপে সময়টা অতিবাহিত করিবার জন্য তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের মধ্যে নিজেকে নিজে জোর করিয়া টানিয়া লইলেন।

[দুই]

বসন্তের অলস মধ্যাহ্নে সুরবালা বড় অবসন্নহৃদয়ে একখানা মাদুর পাতিয়া পড়িয়া ছিল। দীপ্ত দ্বিপ্রহরে কোকিল ডাকিতেছে, পাপিয়া তান তুলিয়া বেসুরা গাহিতেছে। বাতাস বকুলের তীব্র গন্ধ বহিয়া আনিয়া জানালাপথে ঘরের মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িয়া ওলটপালট্ খাইতেছিল। অতর্কিতে সুরবালার সারা শরীরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয়ের গোপনীয়তম প্রদেশ হইতে একটা অশান্তির গাঢ় ছায়া তাহার করুণ-কোমল মুখখানাকে বড় অন্ধকার করিয়া তুলিল। ব্যর্থতার বিপুল নৈরাশ্য জ্বলন্ত লৌহ-শলাকার মত যেন তাহার অন্তরের অভ্যন্তর-ভাগ পোড়াইয়া দিতে লাগিল। উদাসনেত্রে দিগ্‌ভ্রান্তের মত চতুর্দ্দিক চাহিয়া একটা দেরাজ হইতে কাগজ-পত্র ও দোয়াত-কলম লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে স্বামীকে এক-খানা চিঠি লিখিতে বসিল।

"স্বামিন্ দেবতা!

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাকেই তোমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে হইল। হৃদয়ের বেদনা গোপন করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম, তাহা অসম্ভব! জোর করিয়া যতই গোপন করিবার চেষ্টা করি, হৃদয়-জোড়া ব্যর্থতার ব্যঙ্গ হাসি সে বেদনাকে যেন দ্বিগুণভাবে বাড়াইয়া দেয়। আজ বড় অসময়ে

বেদনাটা আবার বাড়িয়া উঠিয়াছে—তাই যন্ত্রণাপূর্ণ হৃদয়ে বড় আশায় এক বিন্দু শান্তি-বারির জন্য দেবতার চরণে আশ্রয় লইলাম। দেখি—ব্যথিতার প্রার্থনায় দেবতার হৃদয়ে দয়া হয় কি—না? ইন্দু—ও-বাড়ীর ইন্দু আমাদের বাড়ী আসে না, আর তাহার অমিয়মাখা হাসিতে এ বাড়ী মাতিয়া উঠে না;—কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দম্‌কা বাতাস যেন চতুর্দ্দিক হইতে বিষাদ-রাশি উড়াইয়া আনিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে ছড়াইয়া দেয়। আর প্রাণ বড় অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। কাকীমা—ও-বাড়ীর কাকীমা, যাঁহার সস্নেহস্পর্শে পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নিমেষে কোথায় মিশিয়া যায়,—সেই কাকীমার সহিত দিনান্তে একবারও দেখা করিয়া হৃদয়ভার লাঘব করিবার সাধ্য নাই। একটা আশঙ্কায়, সে ইচ্ছাটা যেন হৃদয়ের এক কোণে বড় জড়-সড় হইয়া ওঠে। আর কাকাবাবু—সেই উদার, সৌম্য, শান্ত-পুরুষ নিষ্ঠুরতার আচরণে একান্ত পীড়িত হইয়া, মস্ত একটা ব্যথা বুকে করিয়া আজ কয়দিন হইল কর্ম্মস্থলে গিয়াছেন। ঠাকুরপো বাটী আসিয়াছিল, কিন্তু কয়দিন থাকিয়াই একটা মর্ম্মান্তিক যাতনায় ব্যথিত হইয়া বড় অতিষ্ঠ প্রাণে আবার কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। এখন সংসারে পূর্ব্বেকার আনন্দের পরিবর্ত্তে আছে কেবল—নিরানন্দ—বিষাদ! কারণ—আত্মাভিমানী পিতার স্বার্থের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ও বাড়ীর কাকাবাবু একদিন একটী দীন দরিদ্রের জন্য, একটু অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, তাঁহার কাতর প্রার্থনামূলে পদাঘাত করিয়া পিতা নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার

আশা মিটে নাই—কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া শাস্তিস্বরূপ ঐ পুণ্য-পবিত্র নিরীহ ক'টী প্রাণীর সহিত এ বাড়ীর কাহারও কোন সম্পর্ক থাকিবে না—এই হুকুম জারি করিয়াছেন। সেই অবধি একটা অশান্তির গাঢ় ছায়া চতুর্দ্দিকে বড় অন্ধকার পাকাইয়া তুলিয়াছে! তাই বলি, পার যদি, তবে চেষ্টা করিয়া এই বিষাদ-কালিমা দূর করিও। ব্যথিতার কাতর ক্রন্দন যেন নিষ্ফল না হয়। আর লিখিবার কিছুই নাই, সেবিকার প্রণাম জানিও,—তোমায় প্রণাম ছাড়া আর কিছু দিতে ইচ্ছা হয় না।

সেবিকা—

সুরবালা"

পত্রখানি খামে আঁটিয়া শিরোনামা লিখিয়া ডাকে দিবার জন্য সুরবালা বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—"নীরদা"।

অলস-নয়নে নীরদা তখন একটু ঝিমাইতেছিল, সুরবালার গলার আওয়াজে শশব্যস্তে উপরে উঠিয়া বিনীত স্বরে বলিল,—"আমায় ডাক্‌ছিলে কেন বৌমা?"

"এই চিঠিখানা ডাকে দিয়ে আয়।"

নীরদা চিঠিখানা হাতে লইয়া এক পা বাড়াতেই, সুরবালা ডাকিল,—"শোন্ নীরদা"—"আবার পিছু ডাক্‌লে মা।" "তা হো'ক্—আর একটা কাজ করিস্—একবার ও-বাড়ীর ইন্দুকে নিয়ে অসিস্।"

ভয়াকুল নয়নে সুরবালার মুখের দিকে তাকাইয়া নীরদা বলিল,

—"সে কি বৌমা ! কর্ত্তা যে তা' হ'লে"—"তোর সে ভাবনা নেই। খিড়কীর দরজা দিয়ে লুকিয়ে একবার তাকে নিয়ে আসবি। তুই শিগ্‌গির যা, দেরী করিস্‌নে। এখন তিনি বাইরে আছেন।" নীরদার আর কোন কথা না শুনিয়া, চঞ্চলচিত্তে সুরবালা গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

অনন্যোপায় হইয়া নীরদা, সুরবালার আদেশ মাথায় করিয়া ক্রমে ক্রমে পা বাড়াইয়া চলিয়া গেল। চিঠিখানা ডাকে ফেলিয়া, আজ কত দিন পরে ইন্দুদের বাড়ী আসিয়া নীরদা ডাকিল,—"বৌ ঠাকুরুণ কোথায় গা ?"

নীরদার গলার আওয়াজ শুনিয়া, পঙ্কজিনীর প্রাণের ভিতরটা পুলকে নাচিয়া উঠিল—'তবে ত বৌমার খবর পাওয়া যাবে!' হর্ষোল্লাসে হাতের পশমের কাজটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নীরদাকে বলিলেন,—"নীরদা, বৌমা ভাল আছেন ?"

"তা'ত, বেশ বুঝ্‌তে পারিনে বৌঠাকুরুণ ;—খাওয়া দাওয়াত করেন, কিন্তু দিন দিন কেমন শুকিয়ে উঠ্‌ছেন।"

"বুঝেছি নীরদা—বৌমা যে আমাদের বড্ড বেশী ভালবাসেন" বলিয়া পঙ্কজিনী একটা চাপা শ্বাস ত্যাগ করিলেন। "ইন্দু দিদিকে যে একবার ও-বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে বৌমা আমায় পাঠিয়ে দিলেন বৌ ঠাকুরুণ ?"

ক্ষুণ্ণস্বরে পঙ্কজিনী বলিলেন,—"নিয়ে'ত যাবি নীরদা ; কিন্তু যদি—"

"আমিও তা' বলেছিলাম—বৌমা তা' শুন্‌লেন না।"

"বৌমা, ছেলে মানুষ। যাই হো'ক, তাঁর যখন ইচ্ছা—তখন তুই একবার নিয়ে যা; কিন্তু কেমন ভয় হ'চ্ছে নীরদা।"—

"আমারও মনটা কেমন ক'চ্ছে বৌঠাকরুণ।"

"তবে কাজ নেই—বৌমাকে বুঝিয়ে বলিস।"—কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া পঙ্কজিনী আবার বলিলেন,—"না না; নীরদা বৌমা যখন 'ব'লেছেন—তখন তুই একবার নিয়ে যা। দেখি, সে কোথায় গেল।"

ইন্দু কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল, কতকগুলা বকুলফুল আঁচলে লইয়া ছুটিয়া আসিয়া জননীকে দেখাইল,—"দেখ মা, কত ফুল কুড়িয়ে এনেছি—।" কিন্তু সম্মুখে নীরদাকে দেখিয়াই যেন থতমত হইয়া গেল। নীরদা তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়া খপ্ করিয়া তাহার সেই কুসুম-কোমল হাত-দুখানি ধরিয়া বলিল,—"তোমার যে বৌদি', ডেকেছেন দিদিমণি।"

ইন্দু তাহার পুষ্পোপম মুখখানি একটু তুলিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে জননীর মুখের পানে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া পঙ্কজিনী বলিলেন,—"তোর বৌদি' ডেকেছেন, তুই একবার যা ইন্দু।"

আনন্দে ইন্দুর বুকের ভিতরটা নাচিয়া উঠিল। কতদিন যে, সে তাহার বৌদিদির কাছে যায় নাই—আজ তাঁহার আহ্বানে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিতেও, আর তাহার ইচ্ছা হইল না। সোল্লাসে নীরদার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—"আয় শিগ্‌গির আয়, বৌদি'র কাছে যাই।" প্রীতিপূর্ণ নয়নে মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া

ইন্দু বলিল,—"বৌদি' আমায় ডেকেছেন, আমি যাই মা,—কেমন ?"

পঙ্কজিনী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। চঞ্চলপদে ইন্দু নীরদার হাত ধরিয়া ওবাড়ী চলিয়া গেল।

সুরবালা অস্থিরচিত্তে কক্ষের বাহির হইয়া বারান্দায় আসিতেই, সম্মুখে ইন্দুকে দেখিয়া স্নেহাবেগে সজোরে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। আত্মসমর্পণকারী নিরুপায় শিশুর মত ইন্দু করুণনেত্রে সুরবালার মুখের পানে তাকাইয়া আধ-হাসি মুখে বলিল,—"বৌদি' ! তুমি আমায় ডেকেছ ?" বীণার মৃদু ঝঙ্কারের ন্যায়, বসন্ত-কোকিলের সুললিত কূজনের ন্যায়, ইন্দুর স্বর-লহরী সুরবালার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়া উঠিল। পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। অশ্রুসিক্ত কৃষ্ণতার নয়ন-দুটী বসনাঞ্চলে মুছিয়া, সুরবালা ইন্দুর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল,—"এত দিন আসিস্ নি কেন ইন্দু ?"

অতি সরল সহজভাবে ইন্দু বলিল,—"তুমি যে বারণ করেছিলে বৌদি' ?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুরবালা ইন্দুর চিবুকস্পর্শ করিয়া সস্নেহকণ্ঠে বলিল,—"একবার ক'রে রোজ আসিস্—বারণ ক'রেছিলাম ব'লে কি একবারও আস্তে নেই, দুষ্টু মেয়ে"—বলিয়া সুরবালা তাহার স্বভাবলোহিত গণ্ডদেশ আদরে টিপিয়া দিল।

শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে ইন্দু বলিল—"এইবার থেকে তবে রোজ আস্‌বো বৌদি'—কেমন ?"

অনুতাপের আবেগে সুরবালা ইন্দুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া শান্ত মুগ্ধ নয়নে একবার আকাশের দিকে তাকাইল।— সে কি সুন্দর-স্বচ্ছ, উদার-অনন্ত। উহাতে কৃত্রিমতা নাই, পাপ নাই, হিংসা-দ্বেষ নাই—অযথা আভিজাত্যের উন্মাদনা নাই,—আপন মনে আপনি বিভোর, আপন গর্ব্বে আপনি নত। আর এই দশম বর্ষীয়া ইন্দু, এ-ও যেন কতকটা তাই। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ব্যাকুল নয়নে চিরউন্মুক্ত গগনের দিকে তাকাইয়া ভক্তিপূর্ণ স্বরে সুরবালা বলিয়া ফেলিল,—"দয়াময়—তোমার চরণে প্রার্থনা—এই সরলা বালিকা যেন আমাদেরই হয়। এমনি—এমনি ভাবে একদিন এক-জনের হাতে হাতে"—অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া জীবন-বাবু অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া রোষ জ্বলিতকণ্ঠে স্খলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁগা বৌমা, তোমরা কি আমায় আর বাড়ীতে তিষ্ঠুতে দেবে না? এমনি ক'রে রোজ আমার চোখের সাম্‌নে—একরকম আমায় অপমান করা? শোন বৌমা, তোমাদের এসব দোষ আমি একটুও ক্ষমা ক'রব না; যদি পাথরের মত শক্ত হ'তে হয়—তাও হ'ব। কিন্তু আমার কথা বজায় থাকবে—এটা স্থির জেনো।" বলিয়া ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে, সমস্ত মুখখানা লাল করিয়া, রতনের নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে, নীচে নামিয়া আসিলেন।

ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, সুরবালা সেইখানে বসিয়া পড়িয়াছিল। আর ইন্দুর সেই কোমল করুণ মুখখানি আতঙ্কে সাদা ফেকাসে হইয়া উঠিয়াছিল।

অবসন্ন শরীরের ভার দেওয়ালের গায়ে রাখিয়া সুরবালা সজল-নয়নে কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—“তুই এখন যা—ইন্দু।” পাণ্ডুবর্ণ ম্লানমুখে ইন্দু একবার সুরবালার দিকে সকরুণ চাহনি চাহিয়া ক্রমে ক্রমে পা বাড়াইয়া চলিয়া গেল। পুঞ্জীকৃত বেদনারাশি বুকে লইয়া সুরবালা কক্ষমধ্যে অর্গলরুদ্ধ করিয়া শক্ত সিমেণ্টের মেজের উপর মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

মুঙ্গেরের পাদ ধৌত করিয়া ভাগীরথী ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিতা হইতেছেন। নদী-তীরে উকিল অনিল বাবুর দ্বিতল বাসাটী অস্তমান সূর্য্যকিরণে ঈষদারক্ত আভা ধারণ করিয়াছে। দ্বিতলস্থ একটী সজ্জিত কক্ষে একখানি চেয়ারে বসিয়া, অনিল বাবু একান্ত মনঃসংযোগের সহিত একখানি আইনের পুস্তক পড়িতেছে। এমন সময়ে একখানি পত্র হস্তে একজন দাসী আসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—"বাবু, আপনার একখানা চিঠি এয়েছে।"

অনিল বাবু কৌতূহল ভাবে হস্ত বিস্তার করিয়া বলিল,—"কই দেখি।"

পরিচারিকা লেফাফাখানা বাবুর হস্তে দিল। অনিলকুমার পড়িল। সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীচরণেষু।"

আকুল বাসনার সুখোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া অনিলকুমার তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে, তাহার মুখখানা বড় বিবর্ণ হইয়া উঠিল, উদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে পত্রখানার অক্ষরগুলা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বাতায়ন-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নিম্নে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তরতর বেগে অবিরাম গতিতে চলিয়াছে, ঊর্দ্ধে উদার অনন্ত আকাশ, যেন কাহার মহিমাভারে আপনি নত

হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে, অসংখ্য তরণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-মালায় গঙ্গাবক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিল। নীল আকাশ অগণিত তারার হার পরিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল! সান্ধ্য-সৌন্দর্য্য দর্শনে অনিলের হৃদয় যেন অনেকটা শান্ত হইল—কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া একটা করুণ হাহাকার যেন অন্তরের অভ্যন্তর-ভাগে বড় গোলমাল বাধাইতে লাগিল। অবসাদগ্রস্ত হৃদয়ে একখানা ইজি চেয়ার টানিয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল, আর মাঝে মাঝে এক একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে অনিলকুমার ভাবিতেছিল,—তাহার এখন কর্ত্তব্য কি? একদিকে জীবনের সর্ব্বস্ব, সংসারের প্রিয়তম, অনন্যহৃদয়া পত্নী সুরবালা তৃষিত হৃদয়ে একবিন্দু সহানুভূতির জন্য তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে—অন্য দিকে ক্রোধোদ্দীপ্ত পিতার উজ্জ্বল নয়ন যেন তাহাকে পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। আর ঠিক তাহারই পশ্চাতে মঙ্গলময়ী দেবীস্বরূপিণী, তাহার কাকীমা আজন্মসঞ্চিত স্নেহের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার পুণ্যপবিত্র স্নেহের কোমল কোলে তুলিয়া লইতেছেন। চিন্তাভরে তাহার হৃদয় যেন মাটীতে লোটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল, অলস অবসন্নভাবে নয়ন-দু'টী মুদ্রিত করিয়া, অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া অপরাধীর মত জড়িতকণ্ঠে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—"সুরবালা, অকর্ম্মণ্য আমি—ক্ষমা করিও। আমায় তোমাদের শান্তির মধ্যে লুকাইয়া রাখিও, স্বার্থদীপ্ত হিংসা-পরায়ণ পিতার তীব্র চাহনির সম্মুখে

আমায় ছাড়িয়া দিও না !—বলিয়া একখানা চাদরে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি হইল, আহার করিবার জন্য দুই তিনবার ঝি আসিয়া ডাকিয়া গেল, কোন সাড়া-শব্দ নাই। পুনরায় একটা চাকর আসিয়া ডাকিল—"বাবু, খাবেন আসুন,—রাত হয়েছে, বামুনঠাকুর চলে যাচ্ছে।" বিরক্তি-পূর্ণস্বরে অনিলকুমার তাহাকে জবাব দিল—"যাক্, সব চলে যাক্, আজ আমি খাব না—তোরা খেগে যা।"—বলিয়া হৃদয়ের চিন্তা-স্রোত সজোরে চাপিয়া পড়িয়া রহিল।

রাত্রির শেষ মুহূর্ত্তে নীচের তলায় একটা সোরগোলে অনিল-কুমার দুঃস্বপ্ন-জাগ্রত মানুষের মত উঠিয়া বসিল। মনের গতি কেমন সংশয়সঙ্কুল জড়তা মাখান, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে, দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া সিঁড়ির নিকটে আসিতেই সম্মুখে বৃদ্ধা ঝি আসিয়া সংবাদ দিল,—"বড় বাবু, শীগ্‌গীর নীচে নেমে আসুন।—ছোটবাবু বড্ড অসুখ নিয়ে কল্‌কাতা হ'তে এয়েছেন।"

আকস্মিক দুঃসংবাদে অনিলের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। চোখমুখ কেমন অস্বাভাবিক লাল হইয়া উঠিল, উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দিশাহারার মত সিঁড়ি হইতে নামিয়া, নিম্নের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া সহসা থামিয়া পড়িল। একটা অজ্ঞাত ভয়ে, কণ্টকিত দেহে, স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শয্যায় শায়িত রুগ্ন শিশির বোধ হয় জ্যেষ্ঠের আবেগব্যগ্র পদশব্দ শুনিতে পাইয়া-ছিল। সহসা সে শব্দ নীরব হওয়াতে ক্লান্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

"কে—দাদা ?" অনিলের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—"শিশির—শিশিরের গলা এত ক্ষীণ—এত দুর্ব্বল !"

ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অনিল অতি সন্তর্পণে শিশিরের মাথাটা বালিশের উপর হইতে নিজের কোলে তুলিয়া সযত্নে তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"এতো অসুখ হয়েছে, আর আমায় খপর দিস্‌নি ?—শিশর তুই ভারী ছেলেমানুষ৷" ক্ষীণকণ্ঠে শিশির বলিল—"য্যাতো বেশী হবে, তা বুঝতে পারিনি দাদা।"

"আর এই অসুখ নিয়ে তোর একলা আসা ভাল হয় নি ; রাস্তায় যদি কোন বিপদ হত ?"

মুদিত চক্ষে ভগ্নস্বরে শিশির বলিল—"গাড়ীর এক ভদ্রলোক দয়া ক'রে আমায় এই বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তিনি বড় ভাললোক।"

সহসা বক্ষের উপরে কি একটা বেদনায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া গেল। অনিল আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল—"শিশির।" কোন সাড়াশব্দ নাই, নীরব নিস্পন্দ অশ্রুপূর্ণ চক্ষে জড়িত স্বরে অনিল ডাকিল—"বিহারী—বিহারী, শীগ্‌গির হরেন্ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়। ঝি, তুমি একটু গরম দুধ নিয়ে এসো। আমি একটু মাথায় পাখার বাতাস করি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রোগীর ওষ্ঠে চামচে করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দিতে দিতে ব্যাকুল আগ্রহে অনিল, শিশিরের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল—"শিশির—শিশির।" অজ্ঞানাবস্থায় মোহজড়িত স্বরে শিশির বলিতে লাগিল, "কাকীমা,—বৌদি'—"

এমন সময়ে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল, "এ যে টাইফয়েড জ্বর—অনিলবাবু? খুব সাবধানে থাকতে হবে; তবে ভয় নেই—" শিশির তখন সংজ্ঞাশূন্য।

ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পর অনিল, শিশিরের খুব বেশী অসুখ জানাইয়া, তাহার কাকীমা ও তাহার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে আসিবার জন্য পিতাকে একখানি টেলিগ্রাম করিল।

সেদিন সমস্ত দিনরাত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনিল, শিশিরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রান্তভাবে সেবা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা ঝি ও চাকর বিহারী মধ্যে মধ্যে তাহার সহায়তা করিতে লাগিল।

(১১)

বেলা তৃতীয় প্রহর। জীবনবাবু বৈঠকখানা গৃহে একখানি সজ্জিত পালঙ্কের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া তন্দ্রাভরে ঝিমাইতেছিলেন, গালিচামোড়া মেঝেয় বসিয়া দূর হইতে রতন টানাপাখার দড়ি ধরিয়া মৃদু মৃদু টান দিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রান্ত অলস নয়ন-দুটি যেন আপনা হইতেই বুজিয়া আসিতেছিল। সহসা দ্বারদেশে একটা পিয়ন আসিয়া হাঁক দিল,—"বাবু, আপ্‌কো একঠো তার আয়া।" ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জীবনবাবু বাহিরে আসিয়া টেলিগ্রামখানা হাতে লইয়া একটু শিহরিয়া উঠিলেন,—কম্পিত হস্তে টেলিগ্রামখানা খুলিয়া পড়িতে পড়িতে, তাঁহার মুখখানা বড় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। একটা গাঢ় ম্লানিমায় তাঁহার বদনমণ্ডল যেন বড় মলিন হইয়া গেল, মুহূর্ত্ত পরেই টেলিগ্রামখানা পড়া শেষ হইলে তাঁহার মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মুখখানা রক্তরাঙ্গা করিয়া একান্ত আগ্রহবশে ফুলিতে ফুলিতে, টেলিগ্রামখানা রতনের দিকে ছুড়িয়া দিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন ;—"ওরে রতনা,—এইনে টেলিগ্রামখানা ; মুঙ্গেরে ছোটবাবুর ভারী অসুখ! ও-বাড়ীর ওই যতীনের বউটাকে আর আমাদের বৌমাকে নিয়ে, তোকে এখুনি যেতে হবে ; বৌমাকে খবর দিয়ে আয়।" বলিয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে, কক্ষমধ্যে জোরে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

রতন ভয়ে জড়সড় হইয়া টেলিগ্রামখানা কুড়াইয়া লইয়া শশব্যস্তে অন্দরে আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"বৌমা, মুঙ্গের থেকে এই টেলিগ্রাম এয়েছে; ছোটবাবুর বড্ড অসুখ—আপনাকে আর ও-বাড়ীর মাঠাকুরুণকে সঙ্গে নিয়ে আমায় এখুনি যেতে হবে,—বাবু বলে দিলেন।"

শিশিরের অসুখ শুনিয়া সুরবালা আলুথালু হইয়া মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"রতনদা, —বাবা এ টেলিগ্রাম দেখেছেন ত?" রতন বলিল "তিনিই ত, আমায় পাঠিয়ে দিলেন বৌমা।"

অভিমান-জড়িতস্বরে সুরবালা উত্তর করিল,—"ঠাকুরপোর এমন অসুখের খবর এল, তা শুনেও তিনি নিজে না এসে তোমায় পাঠিয়ে দিলেন কেন—রতনদা'?" রতন আর কিছুই বলিল না, কেবল নীরবে মাটীর দিকে মুখ করিয়া নখে মাটী খুঁটিতে লাগিল।

শ্বশুরের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে সুরবালার হৃদয় কেমন যেন বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, ব্যথায় অস্থির হইয়া জ্ঞানশূন্যা উন্মাদিনীর মত দ্রুতপদে মুহূর্ত্তমধ্যে ইন্দুদের বাড়ীর ভিতর গিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ভয়াকুলস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কাকীমা—কাকীমা, কোথায় মা তুমি? মুঙ্গেরে ঠাকুরপোর বড্ড অসুখ! তোমায় এখনি যেতে হবে কাকীমা। আমার যে বড্ড ভয় হচ্ছে কাকীমা!"—বলিয়া সজলনয়নে পঙ্কজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অকস্মাৎ শিশিরের অসুখ শুনিয়া পঙ্কজিনীর শরীরের ধমনীতে প্রবহমান রক্ত যেন জমাট বাঁধিয়া গেল, বুকের ভেতরটা কাঁপিয়া

উঠিল! ধপ্ তিনি করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুরবালার কারুণ্য-বিজড়িত দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিশাইয়া নিমেষহীন চাহনিতে আকুলভাবে, উদাস প্রাণে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মন তখন জগতের সমস্ত কথা ভুলিয়া, সেই মাতৃহীনা শিশিরের জন্য উতলা হইয়া উঠিয়াছিল। মুহূর্ত্তমাত্র মৌনভাবে চিন্তা করিয়া পঙ্কজিনী সস্নেহে সুরবালার হাত দুখানি ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"বৌমা, তা হলে এখুনি যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নাও গে। কিন্তু তোমার শ্বশুর কি আমাদের ক্ষমা করবেন মা?" অভিমানে সুরবালা ঠোঁট-দুখানা কাঁপাইয়া বলিয়া ফেলিল,—"জানিনা মা,—বাবা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন"— হৃদয়ের প্রগাঢ় আবেগে যেন তাহার বাক্‌রোধ করিয়া দিল; আর কিছু না বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি বাটী ফিরিয়া আসিল।

"নীরদা—ও নীরদা,"—বলিয়া সুরবালা দুইবার ডাকিতেই নীরদা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"কি বৌমা?" "শীগ্‌গির ঐ পোর্টম্যানটায় আমার কাপড়-চোপড়-গুলো গুছিয়ে দে।"

নীরদা বিস্মিতভাবে বলিল,—"কেন বৌমা, হঠাৎ এ সব কেন?" "কেন কি, শুনিস্ নি? ঠাকুরপোর অসুখ,—এখুনি মুঙ্গের যেতে হবে। তোকে ত নিয়ে যাওয়া চলবে না, তুই বাড়ীতে থাক্। আর কাকীমাদের বাড়ীটাও দেখিস্"—বলিয়া সুরবালা তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছাড়িয়া, অবিলম্বে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল, পশ্চিমের সূর্য্য ঢলিয়া

পড়িয়া অভিমানে ক্ষোভে রক্তরাঙ্গা হইয়া পৃথিবীর বক্ষে যেন আবীর ছড়াইয়া দিতেছিল। জীবনবাবু মুখখানা লাল করিয়া অন্দরের মধ্যে আসিয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে ডাকিলেন,—"কোথায় গা বৌমা, সব ঠিক হয়েছে?—গাড়ী যে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে—শীগ্‌গির যাও, দেরী করো না।"

"যাই বাবা"—বলিয়া সুরবালা তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া প্রার্থনাপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "বাবা—আপনি যাবেন না?"

গম্ভীরকণ্ঠে জীবনবাবু উত্তর করিলেন—"না।" এই 'না'র উপর সুরবালা আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না, আবেগরুদ্ধহৃদয়ে শ্বশুরের পদধূলি লইয়া বলিল,—"বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন গিয়ে ভাল দেখি।" সহসা সুরবালার চোখ ছাপাইয়া জল গণ্ডস্থল বাহিয়া পড়িল। শূন্য উদাস হৃদয়ে সুরবালাগাড়ীর এক-কোণে গিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘড়ঘড় করিয়া যাইতে যাইতে,গাড়ীখানা ইন্দুদের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পঙ্কজিনী একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাসে কম্পিত বক্ষটাকে আরও কাঁপাইয়া ইন্দুর হাতটা ধরিয়া মন্ত্রমুগ্ধার মত গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। রতন, বাটীর দরজায় তালাবন্ধ করিয়া পঙ্কজিনীর হাতে চাবি দিয়া গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিল। আধঘণ্টা পরে গাড়ীখানা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল, সকলে শকট ত্যাগ করিয়া ট্রেণে গিয়া উঠিল। একটা দুর্ব্বিষহ চিন্তার ভার বুকে লইয়া পঙ্কজিনী গাড়ীর এককোণে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

"আমার বড় শীত কচ্ছে কাকীমা।"—বলিয়া সুরবালা

আগাগোড়া একখানা চাদর ঢাকা দিয়া পঙ্কজিনীর গায়ে ঘেঁস দিয়া বসিয়া পড়িল। ইন্দু অতি সঙ্কোচে তাহার বৌদিদির হাত-ছ'খানি ধরিয়া বলিল,—"আমি এইখানে বসি বৌদি'।" সুরবালা স্নেহা-বেগে ইন্দুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। রতন জিনিসপত্র যথাস্থানে রক্ষা করিয়া ট্রেণের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া একটু ঝিমাইতে লাগিল।

[১২]

সারারাত রোগীর পার্শ্বে বসিয়া অশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্লান্তিভরে অনিলের চক্ষু দুইটী মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল, অবসাদে সমস্ত শরীরটা মাটীতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল ; বিহারী মাঝে মাঝে কাতর অনুরোধ করিতেছিল,—"বাবু, আপনি একটু ঘুমুন গে, আমরা ত এখন রয়েছি।" তথাপি অনিল সেই ভাবেই শিশিরের পার্শ্বে বসিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিল। ক্রমে বেলা দশটা বাজিলে দ্বারে গাড়ীর শব্দ হইল। ছুটিয়া গিয়া অনিল ডাকিল—"বাবা এয়েছেন?" রতন গাড়ী হইতে ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, "না, দাদাবাবু! তিনি আসেন নি, বল্লেন আমি যেতে পারব না।"

বিস্মিত লোচনে একবার রতনের দিকে দৃষ্টি করিয়া অতিকষ্টে অনিল বলিল,—"শিশিরের এত অসুখ, এ সময়েও বাবা একবার এলেন না রতনদা' ?"—বলিয়াই আকুলআবেগে ছুটিয়া গিয়া তাহার কাকীমার পায়ের ধূলা লইল। পঙ্কজিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"শিশিরকে বিছানায় একা ফেলে রেখে এয়েছিস্ কেন?"

"একা নেই কাকীমা—বিহারী আছে।"

"এখন কেমন আছে?"

"অনেকটা ভাল।"

সকলে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পঙ্কজিনী শিশিরের মস্তক কোলে তুলিয়া সস্নেহে মৃদু হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন, "শিশির ?"

শিশির তখন একটু সুস্থ হইয়াছিল, পঙ্কজিনীর ডাকে চক্ষু মেলিয়া বলিল,—"কাকীমা—এসেছেন ? বৌদি' কোথায়, ইন্দু কই ? বাবা আসেন নি ?" শিশির একবার পরিষ্কার ভাবে চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিল। পিতাকে দেখিতে না পাইয়া,উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা—আসেন নি !" বলিতে বলিতে মানসিক উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া অসাড়ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া আসিল ! পঙ্কজিনী মাথায় বরফ দিতে লাগিলেন, সুরবালা পাখার বাতাস করিতে লাগিল, ইন্দু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার শিশিরদাদার পায়ের তলায় হাত বুলাইতে লাগিল। শিশির মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, পঙ্কজিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কষ্ট হচ্ছে শিশির ?"

"কাকীমা ?"—চমকিত হইয়া শিশির একবার চক্ষু চাহিল। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"কা'র সঙ্গে তোমরা এলে কাকীমা ?"

"রতনের সঙ্গে এসেছি।"

"রতনদা'কে কই দেখিনি ত ?"

"এইখানেই যে ছিল, এখুনি বাইরে গেল।"

একটা উত্তেজনার আকস্মিক আঘাত কাটিয়া যাওয়ার পর নিশ্চিন্ততার একটা শান্ত ছায়া শিশিরের রুগ্ন মুখে ক্রমে ফুটিয়া উঠিল। করুণ নয়নে পঙ্কজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,— "মনে হচ্ছে শীগ্‌গির সেরে উঠ্‌বো কাকীমা।"

"সেরে উঠ্‌বি বই কি শিশির—ভয় করিস্‌ নে"—বলিয়া পঙ্কজিনী মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিল,—"কোন ভয় নেই—তবে এ জ্বরের যেমন ধরণ, একটু ভোগাবে,—একুশদিনের কম জ্বরটা ছাড়্‌বে না। শুশ্রূষায় একটু বেশী দরকার,—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধগুলো যেন ঠিক পড়ে, পথ্য যেন নিয়ম মত দেওয়া হয়।"

অনিল বলিল,—"সেজন্যে আর ভাবনা নেই ডাক্তারবাবু।"

কয়েকদিন ব্যারাম বৃদ্ধির মুখেই চলিল। জ্বরের বিরাম নাই, এক ডিগ্রী কমিলে তখনি দুই ডিগ্রী বাড়িয়া উঠে। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। দিনরাত্রি নিদ্রা নাই—কেবল যন্ত্রণা ও ক্লান্তির জন্য সর্ব্বদা তন্দ্রার মত একটা মোহ রোগীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পঙ্কজিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীকে লইয়া দিবারাত্রি কোনরূপে কাটাইতে লাগিলেন। সুরবালাকে অনিলের খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান থাকিতে বলিয়া দিয়াছেন। অগত্যা সুরবালা সাংসারিক কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, আর ইন্দু তাহার কার্য্যের সহায়তা করিত। রতন, বিহারী, অন্যান্য কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিত। একুশ দিন পরে শিশিরের জ্বর ত্যাগ হইল। বলকারক পথ্যের গুণে দুই একদিনের মধ্যেই সে সকলের সঙ্গে ক্ষীণস্বরে দুই একটি কথা কহিতে লাগিল। ক্রমে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, ম্লানওষ্ঠের ক্ষীণ হাস্যে সকলকে আশান্বিত করিল। ক্রমে শিশির অন্নপথ্য করিল।

একদিন বৈকালে সুরবালা ধীরে ধীরে তাহার কক্ষে গিয়া

দেখিল, শিশির শয্যায় শুইয়া মুক্ত গবাক্ষপথে নীলোজ্জল আকাশের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে; মুখখানি বিবর্ণ, শুষ্ক। স্থিরনেত্রে সুরবালা তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিল, "এখন কেমন আছ ঠাকুরপো? কোন অসুখ ক'রছে না তো?"

"না, এখন ভাল আছি। কাকীমা কোথায় বৌদি?'

পশ্চাৎ হইতে পঙ্কজিনী সস্নেহনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "যে অসুখ হয়েছিলো! ভাল হ'য়ে উঠ্‌বি তার কি আর আশা ছিল? ক'টা দিনরাত্রি যে কি ভাবে কেটেছে, তা ভগবান্‌ই জানেন।"

ইন্দু তাহার ভীত চক্ষু-দুইটী শিশিরের মুখের উপর রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমার তখন বড্ড ভয় ক'রতো শিশিরদা'—আর আড়ালে ব'সে কাঁদ্‌তাম; এখন ভাল হ'য়েছ বলে তাই তোমায় বল্‌ছি।"

শিশির একটু সরিয়া আসিয়া ইন্দুর সেই কোমল হাতখানি নিজের ক্ষীণ হস্তের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল, "এখন আর তোর ভয় করে না ইন্দু?"

কম্পিত স্বরে ইন্দু বলিল—"না।"

শিশিরকে একটু সুস্থ দেখিয়া রতন সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে রাইপুর চলিয়া গেল। অনিল সামান্য একটু কাগজে পিতাকে লিখিয়া দিল,—"শিশির একটু ভাল আছে।" দুঃখে ক্ষোভে তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল! নিজেকে নিজে একটু সংযত করিবার জন্য বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল—

আর উত্তপ্ত অভিমানাশ্রু অবিরল ধারায় নির্গত হইয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল!

পরদিন মধ্যাহ্নে যথারীতি আহার সম্পাদন করিয়া জীবনবাবু অসাধারণ গম্ভীরভাবে বৈঠকখানায় বসিয়া অছেন, রতন আসিয়া অনিলের পত্রটুকু তাঁহার হাতে দিল। পত্রপাঠান্তে মুখখানা অন্ধকার করিয়া তৎক্ষণাৎ জীবন বাবু এক টুকরা কাগজে তাহার জবাব লিখিয়া দিলেন—

"কল্যাণীয়!

শিশির ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। তোমাদের উপর আমার আর সে স্নেহ নাই। আমার অমতে তোমরা ও-বাড়ীর যতীনটার সহিত বারম্বার ঘনিষ্ঠতা বড় বেশী বাড়াইয়া তুলিয়াছ! তোমরা তাহাতে আনন্দ অনুভব কর,—কিন্তু আমার তাহাতে সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যায়। তোমরা আমার কথার অবাধ্য, সে কারণ আমার জীবদ্দশায় তোমাদের এবাটীতে আর স্থান নাই। আমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া এ সমস্ত করিয়াছি; আমার যাহা খুসী তাহাই করিব।—ইচ্ছা হয়, দুর্দ্দান্ত পিতার মৃত্যুর পর পিতৃভিটায় আসিয়া পিণ্ড দিও। ইতি—

জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।"

কয়েকদিন পরে পিতার লিখিত পত্রখানা অনিলের হস্তগত হইল। আবেগ-কম্পিত হস্তে পত্রখানা উন্মুক্ত করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার প্রশান্ত নয়নদ্বয় হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া

যন্ত্রণার অশ্রু মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। যা'র যেখানে ব্যথা, তা'র সেইখানেই আঘাত লাগে। দূর হইতে অনিলের চোখে জল দেখিয়া পঙ্কজিনীর বুকে বাজিল। অতি সন্তর্পণে অনিলের নিকট আসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া সজল চোখের করুণা ছড়াইয়া পঙ্কজিনী বলিলেন—"অনিল, কাঁদ্‌ছিস কেন রে?"

অনিল অবশের মত অবসন্ন স্বরে বলিল,—"চোখের জল যে আপনা হইতেই বেরিয়ে আসে কাকীমা—এই দেখ বাবার চিঠী।"

দমকা বাতাসে পঙ্কজিনীর হৃদয়টা যেন নাড়িয়া দিল, অসাড় হস্তে পত্রখানা লইয়া তাহা পাঠ করিলেন। ক্ষুব্ধকণ্ঠের নিরুদ্ধ আবেগটা যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাঁহার মনকে বড় উদ্বেগ চঞ্চল করিয়া তুলিল। মূর্চ্ছিতার মত স্থিরনেত্রে অনিলের মুখের উপর চাহিয়া পঙ্কজিনী বলিলেন—"অনিল, আজই আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—আর পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে সংসারে শান্তি স্থাপন কর।"

অনিল ব্যস্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিল,—"তা আর হয় না কাকীকা,—ভাঙ্গা জিনিস কখন জোড়া লাগে না।" এক সঙ্গে দুই দুইটা স্মৃতি অনিলের মনে জাগিয়া উঠিল,—পিতার অযথা নিষ্ঠুর আচরণ, আর তাহার কাকীমার স্নেহের কোল হইতে চির-বিদায়! অনিল ব্যাকুলনেত্রে একবার পঙ্কজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"কাকীমা, এটা কি কেবল আমরাই অন্যায় ক'রছি—ভেবে দেখুন দেখি, এতে বাবার কতটা অন্যায়! জোর ক'রে ন্যায়ের উপর অন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারি না।"

শিশির নিকটে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। সহসা আর্ত্ত-স্বরে ডাকিল— "দাদা ?"

অনিল অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা বিচার ক'রে চিঠি দিয়েছেন—তাঁর আদেশ আমাদের মাথায় করে নেওয়া উচিত। এই নে বাবার চিঠি।"

শিশির অতি কষ্টে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করিয়া বলিল, "তবু তিনি যা' বিচার করবেন, সেইটেই মাথা পেতে নেবে ?—তাঁর ভুলটা একবার দেখিয়ে দেবে না ?"

"না—তা পারব না, আমায় তোরা ক্ষমা কর" বলিয়া অনিল কণ্ঠরুদ্ধ অশ্রুর দ্রুত আঘাতে ব্যাকুল হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

কিছুদিন পরে সকলে শুনিল, তাহাদের কাকীমা আজই বাটী যাইবেন। ক্রমে সময় ঘনাইয়া আসিল, সকলকে উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া শিশিরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে ভিজিতে ভিজিতে, পঙ্কজিনী বলিলেন, "শিশির, দেখিস—তোর গরীব কাকীমাকে ভুলিস্‌নে।"

শিশির রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কাকীমা, তোমার স্নেহের ঋণ যে দেহের সমস্ত শোণিত-বিন্দু দিয়েও শোধ হয় না।"

ক্ষণকাল সব নিস্তব্ধ। তার পরে দুইটি কোমল কর-লতা পঙ্কজিনীর স্কন্ধদেশ বেষ্টন করিল। নিরাশার ম্লান নিস্তব্ধতা কম্পিত করিয়া সুরবালার স্নেহকাতর কণ্ঠ মূর্চ্ছনায় ভরিয়া বাজিয়া উঠিল, "কাকীমা,—কতদিন পরে আবার দেখা হবে ?"—

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। পঙ্কজিনী অনুভব করিলেন, অশ্রু-জলে তাঁহার স্কন্ধ ভিজিয়া যাইতেছে, ধীরে ধীরে সুরবালার মুখ এক হস্তে তুলিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে অশ্রু মুছাইয়া বিষাদ-মাখা স্বরে বলিলেন, "বৌমা, আর আমায় কাঁদাস্‌নে মা।" এমন সময়ে চঞ্চল পদে অনিল আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "দাও কাকীমা, তোমার পায়ের ধুলো দাও।"

পঙ্কজিনী আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া, গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি অজস্র স্ফটিক-বিন্দুর ন্যায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যাইবার সময় অতি সোহাগে গোপনে শিশির দুই আঙ্গুলে ইন্দুর গাল-দুটি টিপিয়া দিয়া দেখিল, তাহার শোভন চক্ষু দুইটি জলে টলমল করিতেছে। জনে জনে সকলের নিকট বিদায় লইয়া পঙ্কজিনী গাড়ীতে উঠিলেন। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদাসনেত্রে শিশির তাহার কাকীমার গাড়ীখানার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। বিহারী মাথায় একটা মোট করিয়া ইন্দুদের পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ছুটিল।

কালনেমীর চক্র আবর্ত্তনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, দেখিতে দেখিতে, পাঁচছয়মাস অতিবাহিত হইয়া গেল; ধীরে ধীরে শরৎ আসিয়া দেখা দিল। উদ্যানস্থ সেফালীর মৃদুগন্ধ চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। বঙ্গে শারদীয়া পূজার সমারোহে সকলেই নবোদ্যমে মাতিয়া উঠিল। পূজাবাড়ীর বোধনের সানাইয়ের মৃদুস্বর কর্ণে প্রবেশ করিয়া এক অপূর্ব্ব সুখের আবেশে মাতাইয়া তুলিল। আজ ষষ্ঠী তিথি। প্রবাসের নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্ত্রী-কন্যার সহিত মিলিত হইবার আশায় যতীন বাবুর বুকটা উচ্ছ্বসিত আবেগে আত্মহারা হইয়া উঠিল। নীহারসিক্ত কুন্দকলিকার মত শুভ্র সরল—কন্যা ইন্দুর মুখখানা তাঁহার হৃদয়ের এক কোণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সুদূর পল্লীর নিভৃত প্রান্তে স্বপ্নময় কুঞ্জের মিলনরাগিণীটুকু যেন অন্তরের প্রান্তদেশস্থ ক্ষুদ্রতন্ত্রীগুলিকে অতি সংগোপনে নাড়িয়া দিল। কর্ম্মস্থানের কোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া আকাঙ্ক্ষার বোঝা বুকে লইয়া যতীনবাবু গাড়ীতে উঠিলেন। চলন্ত ট্রেণে বসিয়া দুধারে শ্যামল শস্যের ক্ষেত, পত্র-পুষ্প-শোভিত বৃক্ষরাজি, নানাজাতীয় ক্রীড়াশীল বিহঙ্গম নিচয় প্রভৃতি অমরাবতীতুল্য বঙ্গভূমির সৌন্দর্য্য-খনি দেখিতে দেখিতে, যেন তন্দ্রা-জড়িত মোহে মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে শরতের শান্ত আকাশে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ধরণীবক্ষ রক্তিমরাগে রঞ্জিত করিতে করিতে,

রক্ত ওষ্ঠ ফুলাইয়া পশ্চিমের সূর্য্য ঢলিয়া পড়িলেন। যতীনবাবু গাড়ীর এক কোণে বসিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার সমস্ত শরীর কি একটা আন্তরিক আঘাতে শিহরিয়া উঠিল! মাথায় হাত দিয়া তিনি দেখিলেন, মাথাটা একটু গরম তৎসঙ্গে উষ্ণ নিশ্বাসও নাসিকা হইতে নির্গত হইতেছে। অস্বাভাবিক বেদনায় সারা দেহটা যেন লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে। অভাবিত-পূর্ব্ব আকস্মিক শারীরিক অসুস্থতায় যতীনবাবুর হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ ও আশা, নিরুৎসাহে একেবারে মিলাইয়া গেল। গাড়ী হইতে নামিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া যতীন বাবু বলিলেন—"বাড়ীতে ত যাই, যা হয় হবে।" অতি কষ্টে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া পঙ্কজিনীর বুকটা কেমন আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মুখখানা অত শুক্‌নো কেন? কোন অসুখ হয়নি ত?"

সুগভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত যতীন বাবু বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে।"

পথশ্রমে-ক্লান্ত ব্যাধিযুক্ত অবসন্ন দেহটাকে আর সামলাইতে না পারায় আপনা হইতেই দেওয়ালের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি পঙ্কজিনী স্বামীকে লইয়া গৃহমধ্যে শয়ন করাইলেন। ইন্দু বুকভরা উৎসাহ লইয়া তাহার পিতার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু মাতার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার তরুণ কোমল বুকের রক্তকণাগুলি

জমাট হইয়া আসিতেছিল। অতি সন্তর্পণে ভয়ে জড়সড় হইয়া পিতার মস্তকের নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে পিতার ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "ও-মা, বাবার বোধ হয় বড্ড বেশী অসুখ করেছে! মাথা দিয়ে আগুণ উঠ্‌ছে—গা যেন তপ্ত বালি—কি হবে মা?—আমার ভারী ভয় কচ্চে।"

একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাসে আশঙ্কায় পীড়িত বক্ষটাকে কাঁপাইয়া স্পন্দিত স্বরে পঙ্কজিনী বলিলেন, "কিছু ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না মা! ওঁর অসুখ দেখে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে, হাত পা যেন গুটিয়ে আস্‌ছে মা,—কি জানি কপালে কি আছে।"

ক্ষণেক পরে মুদ্রিত নেত্রে যন্ত্রণাসূচক স্বরে যতীন বাবু বলিয়া উঠিলেন—"উঃ! বড় গায়ে জ্বালা—বড় তৃষ্ণা—একটু জল।"

ইন্দু তাড়াতাড়ি জল আনিয়া সযত্নে পিতার মুখে ঢালিয়া দিল।

"আঃ—বাঁচলাম মা"—বলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। ক্ষণেক চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া যতীন বাবু মৃদুস্বরে ডাকিলেন, "পঙ্কজ! পঙ্কজ! আরও আমার কাছে এস—বাতাস দাও, কাছে বোস আমার। এবার আর বোধ হয় বাঁচ্‌ব না।" যাতনায় দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

পঙ্কজিনী এক হাতে কাপড়ে চোখের জলটা মুছিয়া আশ্বাসসূচক স্বরে বলিলেন, "অমন অলুক্ষণে কথা বোলো না—ভয় কি—সেরে উঠ্‌বে।"

"তোমার আশাই যেন সত্য হয়; আমার বাঁচ্‌তে বড় সাধ।" —বলিয়া যতীনবাবু অতিকষ্টে চোখের জল চাপিয়া পড়িয়া রহিলেন।

দীন ভীতচক্ষে পঙ্কজিনী—স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, একটা গাঢ়তর দুর্ভাবনার ছায়া সেই প্রশান্ত বদন-খানিকে বড় অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। অদৃষ্টের পশ্চাত হইতে দুষ্ট কুগ্রহ আসিয়া যেন তাঁহাদের এই আঁধার কুটীরের আলোটুকু নির্ব্বাপিত করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আতঙ্কে তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, বেদনায় চক্ষু ফাটিয়া অজস্র অশ্রু বক্ষস্থল সিক্ত করিয়া তুলিল।

অশ্রুমুখী জননীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া কম্পিতস্বরে ইন্দু বলিল,—"কেঁদো না মা;—তুমি এত উতলা হ'লে বাবাকে কে সেবা ক'রবে"?—বলিতে বলিতে ইন্দুর সুনীল চক্ষু-দুইটী জলে পূরিয়া আসিল।

ক্ষণেক পরে পঙ্কজিনী কণ্ঠের জড়তা পরিষ্কার করিয়া বলি-লেন,—"তুই এখন ঘুমো ইন্দু, আমি ওঁকে দেখ্‌ছি।"

ইন্দু কিন্তু তাহাতে সম্মত হইল না, করুণ উদাসনেত্রে জননীর দিকে তাকাইয়া ব্যাকুলস্বরে বলিল,—"না না, আজ আমি ঘুমোবো না—আমি বাবার পাশে ব'সে থাক্‌বো—আমি ঘুমুলে তুমি যে একলা থাক্‌বে মা?" ইন্দু সহসা দুই হাতে তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল, বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, —"কি হবে মা? বাবা সার্‌বেন ত?" পঙ্কজিনীর বুক ফাটিয়া

কান্না আসিতেছিল। যতীনবাবু ডাকিলেন,—"ইন্দু মা! ওঃ বড় কষ্ট।" পিতার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে, অতি ধীরস্বরে ইন্দু বলিল, "কি কষ্ট হচ্ছে বাবা?"

যতীনবাবু আর কোন উত্তর করিলেন না, নিস্পন্দ অসাড়ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। রাত্রে ব্যারাম বড় বাড়িয়া উঠিল। রোগী কেবল হাঁপাইতে লাগিল,—অন্যান্য অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। মা ও মেয়ে উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিয়া, বিনিদ্রনয়নে সারারাত কাটাইয়া দিল। প্রভাতে দিবমণির আলোকে আশ্বস্ত হইয়া, ইন্দু আগ্রহভরে বলিল,—"আমার বাবাকে ভাল ক'রে দিয়ো ঠাকুর"—সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিও নত করিল। একটু বেলা হইলে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল,—"নিউমোনিয়া রোগ, বুকেপিঠে শ্লেষ্মা জমিয়াছে,—সমস্ত দেহে খুব সেক্‌তাপ দিতে হইবে, অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইবে,—তবে বিশেষ ভয় নেই" ইত্যাদি। যতীনবাবু তখন সংজ্ঞাশূন্য। ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পর—পঙ্কজিনীর বুকে একটা হাহাকার জাগিয়া উঠিল, বিহ্বলের মত স্বামীর শয্যাকোণে বসিয়া আকুলমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

দুশ্চিন্তার ম্লান ছায়া মুখে লইয়া ইন্দু আসিয়া বলিল, "মা, শিশিরদা'কে খবর দাও—তিনি আসুন। তুমি একা সব সময় কি কর্‌বে—না কর্‌বে স্থির ক'র্‌তে পার্‌বে না; তিনি এলে আমাদের অনেকটা সাহস হবে।"

এতখানি বিপদের মাঝে পড়িয়া পঙ্কজিনীর বিবেকবুদ্ধি সমস্ত

লোপ পাইয়া গিয়াছিল। নৈরাশ্যের তপ্ত শলাকার আঘাতে তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়া তুলিয়াছিল। শিশিরের কথাটা এতক্ষণ ভাবিতে পারেন নাই,—এই দারুণ বিপদের মাঝে শিশির যে তাঁহাদের কতটা আশ্রয়, তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কন্যার এই সরল সদ্‌-যুক্তিতে প্রাণে বড় একটা আশা জাগিয়া উঠিল। সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"তাই কর্‌ মা,—শিশিরকে শীগ্‌গির একখানা টেলিগ্রাম কর্‌। আমার মাথা কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে,—তুইই যা হয় কর্‌।"

দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্য হইতে ক্ষণিকের জন্য একটা আশার শান্ত ছায়ায় যতীনবাবুর মুখখানি ভরিয়া উঠিল। ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন,—"দাও—শিশিরকে একখানা টেলিগ্রাম করে দাও,—সে আসুক।" মুহূর্ত্তপরে একটা বদ্ধ নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিয়া রোগী আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"উঃ! বুকটায় বড় ব্যাথা, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।"

পঙ্কজিনী অশ্রুপূর্ণ চক্ষে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর পার্শ্বে যাইয়া বেদনা স্থানে—সেক দিতে লাগিলেন।

ও-বাড়ীর রতনকে টেলিগ্রাম করিবার জন্য পাঠাইয়া ইন্দু তাড়াতাড়ি আসিয়া মাতার পাশে দাঁড়াইল। যতীনবাবু একবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ডাকিলেন,—"ইন্দু—মা!"

"বাবা—বাবা"—বলিতে বলিতে,—ইন্দু পিতার দুই পা সবলে বক্ষ মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কেমন একটা মোহে; রোগী—তন্মুহূর্ত্তেই আবার সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইন্দু তাড়াতাড়ি

তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া কাতর রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—"বাবা—বাবা।" পঙ্কজিনী স্বামীর মস্তকে মৃদু মৃদু ব্যজন করিতে লাগিলেন। ইন্দু শশব্যস্তে উঠিয়া গিয়া একটু দুধ গরম করিয়া আনিয়া পিতার মুখে দিতে দিতে ডাকিল—"বাবা—বাবা।" সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যতীনবাবু বলিলেন,—"মা।" ইন্দুর বুকের অবসাদ কতকটা যেন কমিয়া গেল। নীরবে পিতার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া অশ্রান্তভাবে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনাহারে সমস্ত দিন মা ও মেয়ে,—রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে দিনান্তের মৃদু বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া গেল। রোগীর রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মুখেই চলিল। বুকে বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—পিপাসায় মুহুর্মুহুঃ কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দুই একটা অসংযত প্রলাপ বাক্যও বকিতে লাগিলেন। ইন্দু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতরস্বরে ডাকিল—"মা—কি হবে মা?"

অসহ্য ব্যথা বুকে চাপিয়া জননী কন্যাকে বুকে লইয়া সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন,—"কাঁদিস্‌নে মা, চুপ কর—ভগবানে নির্ভর ক'রে স্থির হ'য়ে তাঁকে ডাক্—তিনি দয়া ক'রে ওঁকে ফিরিয়ে দেবেন—"

উন্মাদিনীর ন্যায় জননীর হাত ধরিয়া ইন্দু বলিল,—"দেবেন কি? তিনি কি বাবাকে ফিরিয়ে দেবেন?" ইন্দু একটু আত্মস্থ হইয়া পিতার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে লাগিল। কন্যাকে গোপন করিয়া নীরবে অজস্র অশ্রু মাটীতে ফেলিয়া পঙ্কজিনী বুকের সঞ্চিত বেদনারাশি একটু হালকা করিয়া লইলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত বারটা বাজিল। পঙ্কজিনী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন—অষ্টমীর চন্দ্র আর বড় দেখা যায় না, আকাশ অন্ধকার;—যতদূর দৃষ্টি যায়, অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নাই। বাহিরের অন্ধকার অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যেন বড় বেশী অন্ধকার জমাট পাকাইয়া তুলিয়াছিল। আকাশ বাতাস যেন কাণের কাছে শোঁ শোঁ করিতেছিল, সারাদিনের অনাহারে ক্ষীণ দেহখানা আপনা হইতেই স্বামীর শয্যাপার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল।

গুরুতর যাতনার ভার বুকে লইয়া অতিষ্ঠপ্রাণে শিশির ইন্দুদের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া ধীর মন্থর গতিতে এক পা, এক পা, করিয়া বাটীর ভিতরে অগ্রসর হইয়া আশঙ্কাজড়িত প্রাণে ডাকিল,—"কাকীমা।" ম্লান শুষ্কমুখখানিতে একটু হাসির রেখা টানিয়া আবেগ-ব্যগ্রকণ্ঠে ইন্দু বলিল,—"মা, বোধ হয় শিশিরদা' এয়েছেন—ঠিক যেন তাঁর গলা,—দেখনা মা।"

পঙ্কজিনী শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া চোখ চাহিলেন। শিশির আসিয়াছে শুনিয়া তাহার অশান্ত মনে যেন একটা ক্ষীণ আশার উদয় হইল।

কম্পিতহস্তে দরজাটা খুলিয়া ব্যথিতস্বরে বলিলেন,—"শিশির! আমাদের যে সর্ব্বনাশ হতে বসেছে বাবা!"

সমবেদনার অশ্রুতে শিশিরের চক্ষু দুইটি পূর্ণ হইয়া উঠিল, ভীতিব্যঞ্জক মৃদুস্বরে সে বলিল,—"এখন কেমন আছেন,—কাকীমা?"

"ভাল নয়—বাবা।"

শিশিরের বুকটা বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। উদাসপ্রাণে রোগীর শয্যার একপার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িল। শিশিরকে দেখিয়া ইন্দুর ক্ষুদ্রপ্রাণ আশ্বাসের পুলকে জাগিয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে ইন্দু, পিতার কাণের নিকট গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"বাবা—শিশিরদা' এয়েছেন।"

ক্ষীণকণ্ঠে যতীনবাবু বলিলেন,—"কই ?"

"এই যে কাকা"—বলিয়া শিশির যতীনবাবুর সম্মুখে গিয়া বসিল,—রোগীর মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন নয়নের হর্ষোচ্ছ্বাস দেখিয়া শিশির বিস্মিতভাবে বসিয়া রহিল। একটা মানসিক উত্তেজনায় যতীন-বাবু সহসা শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, শিশির তাঁহার হাতটা ধরিয়া জোর করিয়া শয়ন করাইয়া দিল। সুখ এবং দুঃখের যুগপৎ তীব্র আঘাতে রোগীর সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া গেল। পদতলে উপবিষ্টা ইন্দু ক্রন্দন-কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিল,—"শিশিরদা', বাবা যে কি রকম হয়ে গেলেন ?"

অশ্রুপূর্ণচক্ষে ব্যাকুল ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া ত্বরিতকণ্ঠে শিশির বলিল,—"তুই এদিকে বাতাস কর—কাকীমা মাথায় বাতাস করুন,—আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।—ভয় নেই কেমন মোহ মতন হয়েছে—বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন, তাই।" কিয়ৎক্ষণ এই-রূপ শুশ্রূষার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ক্লান্তকণ্ঠে যতীনবাবু ডাকিলেন, —ইন্দু—মা!" তার পর অতি ধীরে ধীরে শিশিরের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"শিশির ?"

ব্যাকুল প্রাণে শিশির তাঁহার আরও নিকটে যাইয়া উত্তর করিল "কাকা।"

ক্ষণিক পরে যতীনবাবু ইন্দুর ক্ষুদ্র হাতখানি লইয়া শিশিরের হস্তে স্থাপন করিয়া অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে বলিলেন,—"ইন্দুকে তোর হাতে দিয়ে গেলাম শিশির, ভগবান্ তোদের সুখী ক'রবেন।" এতক্ষণে রোগীর মুখে একটা নিশ্চিন্ততার শান্ত ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পঙ্কজিনী সস্নেহনেত্রে শিশিরের দিকে চাহিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা শিশির! ভগবান্ তোদের সুখী করুন।"

হর্ষবিষাদে পঙ্কজিনীর নয়নের প্রবল অশ্রু শ্রাবণের ধারার মত অবিরল ভাবে পতিত হইয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল।

বিস্মিত, স্তম্ভিত, শিশিরের অবশহস্তে ইন্দুর শুভ্র ক্ষুদ্র হাতখানি কাঁপিতেছিল, শোকাচ্ছন্ন নয়ন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু তাহার উপর পড়িয়া মুক্তার মত টলমল করিতেছিল।

শিশির হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কাকীমা! আমি যে—" অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া পঙ্কজিনী বলিয়া উঠিলেন,—"চুপ কর বাবা, চুপ কর।—গ্যাখ গ্যাখ, উনি ও-রকম কর্‌ছেন কেন?"

শিশির যেন তাড়িতাহত হইয়া, উঠিয়া গিয়া দেখিল—রোগীর শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, আর সময় নাই। যন্ত্রণায় তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া

নীরবে রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে যতীনবাবু তাঁহার শেষ নিশ্বাসগুলি ধরণীবক্ষে প্রত্যর্পণ করিয়া মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

ইন্দু হৃদয়ভেদী চীৎকার করিতে করিতে মৃত পিতার বক্ষে পড়িয়া ডাকিতে লাগিল,—"বাবা—বাবা।" তাহার পিতার শ্রবণশক্তি তখন সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে গিয়া মিশাইয়াছিল। মন তখন দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে সেই ধ্যানে মগ্ন। কন্যার কাতর ক্রন্দনে সে ধ্যান আর ভাঙ্গিল না। পঙ্কজিনীর হাহাকারে গৃহ-বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। মৃত স্বামীর চরণতলে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে, ললাট ছিন্ন হইয়া অবিরল ধারায় শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। রক্তচক্ষে একবার শিশিরের দিকে তাকাইয়া মর্ম্ম-ভেদী করুণবিলাপ সহকারে চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"শিশির, আমার সর্ব্বস্ব আজ কে চুরি ক'রে নিয়ে গেল?"

শিশির মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল, কোন সান্ত্বনার বাক্য তাহার মুখে আসিল না। যন্ত্রণায় মাটীতে লুটাইয়া অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিল। রোদনেই যেন শান্তি, ব্যথার উপশম বোধ করিতে লাগিল।

শিশির অনেকক্ষণ পরে সংযত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কেবল একটা হাহাকার আর বিলাপধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ। কি সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য!

পঙ্কজিনী যন্ত্রণায় অস্থির প্রাণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"শিশির এ কি হল বাবা? এ যে নবমীতে বিসর্জ্জন—একদিনও সবুর সইল না,—ভগবান্! এ তোমার কি বিচার?"

শিশিরের বুকটা যেন বিছায় কামড়াইয়া ধরিল, অসহনীয় জ্বালা বুকে চাপিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"অধীর হয়ে ত কোন ফল নেই কাকীমা! মানুষের চেষ্টা যেখানে অসমর্থ, সেখানে যে আমাদের চুপ ক'রে থাকাই শ্রেয়ঃ।"

রোদন-কাতর কণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিয়া উঠিলেন,—"বুকে বড় জ্বালা, স্থির হতে পাচ্ছি না বাবা!" স্তূপীকৃত বেদনার রাশি শিশিরের বুকটা সজোরে চাপিয়া ধরিল। শোকাচ্ছন্না রমণীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। নিশাশেষে মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দন-রোলে জাগরিত হইয়া ও-বাড়ীর জীবনবাবু রতনকে সঙ্গে লইয়া একবারে ইন্দুদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পঙ্কজিনী সলজ্জ-সঙ্কোচে নিজেকে একটু সামলাইয়া মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ইন্দু, কেমন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, মাতার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

বিস্মিত নয়নে জীবনবাবু শিশিরের মুখের দিকে তাকাইয়া তীব্র-কণ্ঠে বলিলেন,—"তুই কখন এলি?" পিতার কণ্ঠস্বরে শিশিরের বুকটা কেমন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মৃদুস্বরে সে বলিল, —"টেলিগ্রাম পেয়ে রাত একটার সময় এসেছি।" মৃত যতীনের পার্শ্বে শিশিরকে দেখিয়া জীবনবাবুর মনটা কেমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সহানুভূতি-শূন্য কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতক্ষণ মারা গেছে?"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে শিশির বলিল,—"প্রায় একঘণ্টা।" ভ্রুকুটী-

কুটিল নেত্রে একবার পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া,—"এখন সব শেষ করে ফেল"—বলিয়া তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। রতন মনিবের ভয়ে কিছু না বলিয়া গোপনে সহানুভূতির অশ্রু ফেলিয়া চলিয়া গেল। নিবিড় দুঃখ ও ক্ষোভে শিশিরের বুকটা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে ঘৃণায় শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"হায়! পিতার প্রাণে কি এতটুকুও কোমলতা নাই—একবিন্দুও করুণা নাই—কেবল কি সৌর-কর-তপ্ত মরুভূমির নীরস বালুকা-রাশি! তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও,—যেখানে মানুষ একবিন্দু জল পায় না! সে গ্রহণ কেবল কি কালবৈশাখের বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ গম্ভীর মেঘ—যাহা অসহায় পথিকের প্রাণে আশঙ্কা জাগাইয়া তোলে! একটা করুণ মর্ম্মস্পর্শী জীবন-নাটকের যবনিকা পতন দেখেও, যে চোখে একবিন্দু জল-সঞ্চার হয় না,—ভ্রুকুটী-কুটিল কটাক্ষ তখনও চোখের কোণ হইতে ছুটিয়া আসে! হাঃ! বিধাতঃ—এও কি তোমারই সৃষ্টি!" ব্যথার অশ্রু শিশিরের চোখের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল।

প্রত্যূষে শিশির, লোকজন ডাকিয়া যতীনবাবুর নশ্বর দেহ সৎকারার্থ লইয়া গেল। ইন্দুর উচ্চ চীৎকারে, পঙ্কজিনীর করুণ বিলাপে, পাষাণের বুকেও চেতনা আনিয়া দিল। কত দিনের প্রতিষ্ঠা একদিনে বিসর্জ্জন দিয়া পঙ্কজিনী আজ সর্ব্বস্বহারা হইলেন। কত দীর্ঘদিনের গড়া কত আশা লোহার মত কঠিন, পাথরের মত শক্ত, যাহা এত শীঘ্র সহজে ভাঙ্গিবে বলিয়া ভাবিতে

পারেন নাই,দুরদৃষ্ট সহসা সে আশাটাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া পঙ্কজিনীকে আজ পথের কাঙ্গালিনী করিয়া তুলিল! আজ তিনি তাঁহার এই ব্যর্থ জীবন লইয়া বিগত সুখশান্তির কথা ভুলিয়া,কি করিবেন, কোথায় যাইবেন ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। পঙ্কজিনীর কাতর চীৎকারে শিশিরের সমস্ত শরীর যেন ভূমিকম্পে নাড়িয়া দিল। চিতার শেষ অগ্নিটুকু পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত করিয়া শিশির যেন কতকটা ঋণমুক্তের মত দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষে ক্ষিপ্তের ন্যায় —বলিয়া উঠিল,—"সব—শেষ কাকীমা! কিন্তু আর পার্‌ছি না, তোমাকে দেখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে কাকীমা।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার ধারের দিকে চলিয়া গেল। স্বামীর চিতায় ভোগ-সুখ-কামনা-বাসনা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া দীনা-ভিখারিণী বেশে পঙ্কজিনী এক-পা এক-পা করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

ইন্দু মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা—কি হোলো মা,—আমাদের এমন সর্ব্বনাশ কেন হল মা?—বাবাগো, —কোথায় তুমি?" কন্যার আর্ত্তনাদে জননীর বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তবু হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে গোপন করিয়া সান্ত্বনা-স্বরে একবার বলিলেন—"ইন্দু,আর কাঁদিস্‌নে মা।" বিবর্ণ কম্পিত মুখে উত্তেজিত স্বরে ইন্দু বলিয়া উঠিল, "কাঁদ্‌বোনা মা—কান্নাই যে আমাদের এখন সম্বল? বাবা যে, বড় কঠিনের মত কেবল কাঁদ্‌বার জন্যই আমাদের এখানে ফেলে রেখে গেছেন—কাঁদ্‌বো না মা? না কাঁদ্‌লে কান্নাগুলো বুকে জড় হয়ে বুকটা ফাটিয়ে দেবে—তখন আর কাঁদ্‌তে পার্‌ব না!—বাবার মূর্ত্তি বুকে ক'রে

কেঁদে বুকটা অনেক ঠাণ্ডা হয়—তাই কাঁদি। মা,—তুমি আমায় কাঁদতে বারণ ক'রো না।”

পঙ্কজিনীর বুকটা কেবল হাহাকারে ভরিয়া উঠিল,—জোড়-হাত করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেন,—“হা বিধাতঃ! কোন্‌ পাপে এই শাস্তি, এত যন্ত্রণা!”

নিরুপায় হইয়া, শিশির মুঙ্গেরে তাহার দাদার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রগাঢ়-বেদনাযুক্ত শিশিরের শুষ্ক মলিন মুখখানি দেখিয়া সুরবালার প্রাণে বড় আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিল। উদ্বিগ্ন-স্বরে সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার মুখখানা অত শুক্‌নো কেন ঠাকুর পো?"

মূর্চ্ছিতের মত স্থির নেত্রে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে শিশির উত্তর দিল,—"মস্ত একটা সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বৌদি'।"

সুরবালার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে? রাইপুরের কি কিছু"—অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া শিশির, অধৈর্য্য প্রাণে ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"কাকাবাবু মারা গেছেন বৌদি।" একটা জ্বালার বহ্নি আগ্নেয় গিরির অনল-উদ্গারের মত তাহার চক্ষু ফাটিয়া নির্গত হইতে লাগিল। সবল-নিক্ষিপ্ত প্রস্তর-খণ্ডের প্রবল আঘাতের মত এই দুঃসংবাদটা সুরবালার প্রাণে বড় আঘাত করিল। অসহ্য প্রাণে কাঁপিতে কাঁপিতে, ধড়াস্ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। সুরবালা নিশ্চল নীরব। দেহের রক্তস্রোতের গতি যেন বন্ধ হইয়া গেল,—কতক্ষণ জড়ের মত থাকিয়া আকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, "এমন শান্তি-কুটীরটুকু ভেঙ্গে দিলে কেন ঠাকুর?" সুদূর পল্লীর নির্জ্জনপ্রান্তে সেই স্নেহকোমলা রমণীর দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া

তাহার হৃদয় বড় অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিল। শত শত বৃশ্চিক যেন সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহার শরীরে দংশন করিতে লাগিল, —যাতনায় অস্থির প্রাণে চেঁচাইয়া উঠিল,—"কাকীমা—মাগো! ইন্দু ছোট বোন্‌টী আমার! হা ভগবান্! তুমি না দয়াময়!—তবে এত কষ্ট দাও কেন ঠাকুর?—এই বিচার কি, তোমার সুবিচার—দয়াময়?" কতক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শান্তস্বরে সুরবালা বলিল,—"কাকীমাকে এখন একলা ফেলে আসা ভাল হয়নি, তোমার থাকা উচিত ছিল।"

উদাসনেত্রে সুরবালার দিকে তাকাইয়া শিশির উত্তর করিল,—"জানি বৌদি',—তবু চলে এসেছি,—সে দৃশ্য বড় মর্ম্মন্তুদ! চোখে অত দেখা যায় না, বুকে অত সহ্য হয় না,—তাই হৃদয়হীনের মত অত শোকের মধ্যেও আমার কাকীমাকে একলা ফেলে রেখে এয়েছি। আমায় ক্ষমা কর—কি ক'রব স্থির ক'রতে না পেরে তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বার জন্য ছুটে এসেছি।"

"কাকীমাকে এখানে নিয়ে আস্‌তে হবে।"

"যদি তিনি রাজী না হন?"

"আমি গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে নিয়ে আস্‌বো, দুঃখিনীর মত সেখানে তাঁকে ফেলে রাখ্‌তে পার্‌বো না।"

শ্রদ্ধায় ভক্তিভরে শিশিরের মাথা তাহার বৌদিদির চরণতলে লুটাইয়া পড়িল, ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বৌদি'—বৌদি', তুমি এত উচ্চে!—অকাতরে একটী বিপন্ন সংসারের ভার মাথা পেতে নিতে চাইচ—এতটা ভাব্‌তে পারিনি।"

"তুমি কি ব'ল্‌ছ ঠাকুরপো! এটা কি এত বেশী কথা—তাঁর বুকের মঙ্গল নিশ্বাস দেবতার আশীর্ব্বাদের মত যে, আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ ক'রে দেবে।"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিশির বলিল,—"কিন্তু—একটা বড় অন্তরায়"—

"বাবার কথা বল্‌ছ—তিনি ত অনেকদিন আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক মুছে ফেলে দিয়েছেন। এখন আর তাঁর সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট আমরা লক্ষ্য করিব কেন?"

"হয় ত কাকীমাই আস্‌বেন না।"

"কেন?"

"পাছে নূতন ক'রে আবার বাবার সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য হয়, সেই আশঙ্কায়। আমার এই বিশ্বাস—আমি যে তাঁকে খুব চিনি।"

"একথাটা—এতক্ষণ মাথায় আসেনি। আচ্ছা—তিনি আসুন। কি বলেন দেখি। এখন তুমি মুখে হাতে একটু জল দাও।" বলিয়া সুরবালা সেস্থান হইতে উঠিয়া গেল। তখন সন্ধ্যার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই, অবসন্ন কর ছড়াইয়া সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকের সীমন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। হোমশিখার মত উজ্জ্বল লালজ্যোতিঃ অর্দ্ধাকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, রাঙ্গাদীপ্তিতে আলো করিয়া প্রকৃতি ছাদের উপর ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে। সারাদিনের কর্ম্মশ্রান্ত দেহ লইয়া অনিল আসিয়া বাসায় উপস্থিত হইল। স্বামীকে দেখিয়া সুরবালার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন দুঃখটা দ্বিগুণ তেজে বাড়িয়া

উঠিল। বাষ্পাকুললোচনে ভগ্নস্বরে বলিল,—"ওগো—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কাকাবাবু মারা গেছেন!"

বিস্মিত স্তম্ভিতের মত অনিল সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। আকাশের বজ্র যেমন ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সৃষ্টির বুকে একটা হাহাকার তুলিয়া দেয়, সহসা অনিলের বুকটা তেমনি বিদীর্ণ হইয়া দারুণ হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে পত্নীর দিকে তাকাইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"কে তোমায় এ সংবাদ দিলে?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুরবালা উত্তর দিল,—"ঠাকুর পো এয়েছে।"

আগ্রহভরে অনিল বলিয়া উঠিল,—"কোথায় সে?"

"ঐ ঘরে"।

স্নেহপরিপূর্ণ কাতরকণ্ঠে অনিল ডাকিল,—"শিশির।"

জ্যেষ্ঠের আহ্বানে পাশের ঘর হইতে শিশির সর্ব্বস্বান্তের মত উঠিয়া আসিয়া নিরাশ কণ্ঠে বলিল,—"দাদা।" ব্যাকুল কণ্ঠে অনিল বলিল,—"কাকার কি হ'য়েছিল শিশির?"

"নিউমোনিয়া।"

"তাতেই মারা গেলেন?"

"হ্যাঁ?"

"ভাল ডাক্তার দেখান হ'য়েছিল?"

"হ্যাঁ?"

"কবে মারা গেছেন?"

"নবমীর রাত্রে।"

"কাকীমার কাছে কে আছে ?"

"কে আর থাক্‌বে, তিনি আর ইন্দু, বাড়ীতে আছেন।"

"এ সময় তাদের একলা ফেলে রেখে আসা ভাল হয়নি।"

"কি ক'রবো কিছু স্থির করতে না পেরে চলে এসেছি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে অনিল বলিল,—"এর আর ভাব্‌বার কি আছে শিশির ?—তাঁকে যে এখন একান্ত আমাদের মধ্যে করেই রাখ্‌তে হবে—নইলে কি তিনি স্থির থাক্‌তে পার্‌বেন ? তুই কালই রাই-পুরে গিয়ে তাঁদের আন্‌বার ব্যবস্থা কর্‌—যাবার সময় কিছু টাকা নিয়ে যাস্‌।" সমবেদনায় অনিলের বুকটা বাজিয়া উঠিল।

জ্যেষ্ঠের উপর একান্ত নির্ভরশীল শিশির, মস্তক নত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তবে তাইই হবে।" বলিয়া অতি ধীরে এক পা, এক পা, করিয়া অগ্রসর হইয়া পাশের ঘরটায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত স্বরে অনিল বলিল,—"সুরবালা, ব'ল্‌তে পার—নারীর কিসে সুখ ?" ভক্তিপূর্ণচিত্তে স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধরিয়া অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে সুরবালা বলিল,—"বুঝি, এই—কেবল দেবতার সেবা, আর কিছু নয়।" শুষ্ক কণ্ঠে অনিল বলিল, —"আর যদি কেউ তাতে বঞ্চিত হয় ?" "জীবনটা একবারে মরুভূমি হ'য়ে যায়, অনন্ত মরুর তপ্ত বালুরাশি, সে প্রাণে কেবল ধূ ধূ করে। আর কিছু থাকে না,—থাকে কেবল উত্তপ্ত মরুর তীব্র জ্বালা—" বলিতে বলিতে, তাহার চক্ষু দুইটী দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বেদনার আঘাতে অনিলের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া

পড়িল ;—হাতে মুখ ঢাকিয়া অধীর প্রাণে বিলাপ করিতে লাগিল, —"আহা হা ! কাকীমা, তুমি যে একটা পুণ্যের সম্ভার ছিলে ! তবে কেন বিধাতা এই জীবনব্যাপী দুঃখের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়া দিলেন ! কাকিমা—মাগো !" উদ্‌ভ্রান্তের মত স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া অনিল বলিল,—"সুরবালা,—কাকীমার বুকের ব্যথা কি আর কেউ মুছিয়ে দিতে পারে ?"

ব্যথার উদ্বেগে সুরবালা আত্মহারা হইয়া বলিল,—"পৃথিবী-শুদ্ধ স্নেহ, দয়া, মমতা, ভালবাসা এক হ'লেও—এ ব্যাথা কেউ মুছোতে পারে না,—পারে কেবল একজন—সে থাকে ঐ উর্দ্ধে, যে ব্যাথার সৃষ্টি ক'রেছে। কেবল নীরবে তাঁর সাধনায় এ ব্যথার উপশম হতে পারে,—নতুবা নয় !"

"তবে কাকীমার জন্য তাঁকে ডাকো, যদি তিনি একটু শান্তি পাঠিয়ে দেন"—একটা উত্তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অনিল শূন্য প্রাণে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুরবালাও ধীরে ধীরে ছায়ার মত স্বামীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল।

উপক্রুত মনটাকে লইয়া শিশির আবার রাইপুরে ফিরিয়া আসিল। শিশিরকে দেখিয়া পঙ্কজিনীর হৃদয়ের প্রধূমিত শোকবহ্নি যেন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। ব্যগ্রসহকারে জ্বলিত কণ্ঠে পঙ্কজিনী ডাকিলেন ;—"শিশির—শিশির বাবা!"

অবশের মত অবসন্ন স্বরে শিশির বলিল,—"কাকীমা।"

পঙ্কজিনী সজল চোখ মুছিয়া ব্যাকুলস্বরে বলিলেন,—"শিশির, আর ত বেশী সময় নেই, ঘরেও আর কিছু নেই; একখানা সোণার গহনা আছে, সেইটাকে বিক্রী ক'রে নিয়ে আয়।"

কশাহত অশ্বের মত শিশির লাফাইয়া উঠিল। পঙ্কজিনীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া নিতান্ত নির্ভরতা-পূর্ণ স্বরে সে বলিল, —"কাকীমা, তোমাকে সে সব ভাব্‌তে হবে না,—যা' ক'রতে হয়, আমি সব ক'রবো।"

পঙ্কজিনী, শিশিরের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল অথচ গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন,—"তুই ত চাকরী করিস্ নে শিশির?"

"দাদা যে সব ব্যাবস্থা ক'রে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমায় কিছু ভাব্‌তে হবে না কাকীমা।"

বিহ্বল নয়নে শিশিরকে লক্ষ্য করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে পঙ্কজিনী বলিলেন,—"না না, সেটা কি ভাল শিশির?" সহজ শান্তস্বরে শিশির উত্তর করিল,—"এতে আর ভাল মন্দর কি আছে কাকীমা? উপযুক্ত ছেলেরা থাকৃতে মা আর কোথায় ভিক্ষে

করতে যায় ? যদি ভিক্ষে করতে হয়, সে সন্তানেই ক'রে। মা কেবল সন্তানের মঙ্গল-কামনায় দিনগুলো কাটিয়ে দেয়—আর সন্তান তা'র কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন ক'রে মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় নেয়। এ তো আর সংসারের কিছু নূতন নিয়ম নয়—কাকীমা ? আমরা ত আমাদের কর্ত্তব্য ছাড়া, এমন বেশী কিছুই করিনি। আশীর্ব্বাদ কর কাকীমা, তোমার আশীর্ব্বাদ যেন আমাদের কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দেয়।"

কৃতজ্ঞতার অশ্রু পঙ্কজিনীর চোখের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তেক মৌন চিন্তার পর একটা চাপাশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন,—"কর্ তোদের যা ইচ্ছে হয়—আমি আর কিছু বল্‌ব না।"—ব্যাকুল আগ্রহে শিশিরের চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন,—"শিশির—বাবা,—তোরাই যে আমার বেদনার শান্তি।"

পাণ্ডুবর্ণ মুখে ইন্দু আসিয়া জানাইল,—"মা, তোমার হবিষ্যির কি হবে মা ?"

"চল্ মা, যাই দেখিগে।—শিশির তুই ঘরে ব'স্।"

ক্ষুব্ধনেত্রে শিশির একবার ইন্দুর দিকে তাকাইল। কিন্তু বড় অসহ্য প্রাণে চোখটা ফিরাইয়া লইল, সে কি নীরস ম্লানমূর্ত্তি ! যেন একখানি ব্যথার ছবি ! আপন মনে ব্যথার ব্যাকুল প্রাণে যেন সকলকে পাগল করিয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছে ! শিশির যন্ত্রণায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উদ্বেগ-চঞ্চল হৃদয়ে ঘরের মেঝেটায় গিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। সমবেদনায় ব্যথাভরা প্রাণে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"ভগবান্ ! তোমার অসীম ভাণ্ডার হ'তে—একবিন্দু

করুণাও কি দিতে পার না ?" অনেকক্ষণ পরে পঙ্কজিনী আসিয়া ডাকিলেন,—"শিশির ওঠ্, নেয়ে দুটি খাবি চল্।"

ক্লান্তস্বরে শিশির বলিল,—"যাই কাকীমা।"

* * * * *

ক্রমে যতীনবাবুর শ্রাদ্ধের দিন ঘনাইয়া আসিল। অগ্ন্যুৎপাতে সর্ব্বস্বান্ত মানুষ যেমন আহার নিদ্রা ভুলিয়া উৎসাহশূন্য প্রাণে সমস্ত শক্তিতে বাড়ী মেরামতে নিযুক্ত হয়, শিশিরও ঠিক সেই ভাবেই যতীনবাবুর শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল।

একাজ সেকাজ করিয়া তাহার যেন আর শ্রান্তি ছিল না। কি করিলে তাহার বিধবা কাকীমা, স্বামীর কার্য্যটী নিখুঁত হইয়াছে বলিয়া চিত্তকে সান্ত্বনা করিতে পারিবেন, সেই চিন্তাতেই তাহার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। আর একদিন পরে যতীনবাবুর শ্রাদ্ধ, দুপুরের রোদ মাথায় করিয়া মুটের মাথায় কতক-গুলি জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া শিশির আসিয়া তাহার কাকীমার সম্মুখে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"কাকীমা, এখন এই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এলাম, আর বাকী সমস্ত জিনিস বৈকালে নিয়ে এলেই হবে।" পঙ্কজিনী বিষণ্ণস্বরে বলিলেন,—"বেশী বাড়াবাড়ি করিস্ নে শিশির! যাদের যা সাজে, তাদের ত সেই ভাবেই চলতে হ'বে। অবস্থা বুঝিয়া—" পঙ্কজিনীর কথাটা সমাপ্ত হইতে না দিয়া, শিশির তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন গুরু যাতনাটা সজোরে চাপিয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিল,—"কেন, কাকীমা, তোমার এমন দুরবস্থাই বা কিসে?—কাকাবাবু ত আমাদের রেখে গেছেন।"

পঙ্কজিনী কেবল মৌন মুগ্ধ দৃষ্টিতে শিশিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, শিশিরকে আর কোন বিষয়ে তিনি নিষেধ করিলেন না। শুষ্কমুখে কাঁদিয়া ফেলিলেন, মনে মনে বলিলেন,—"করুক, ওর যাতে ইচ্ছে হয়, এতেও যদি শান্তি পায়।"

ঘণ্টা-খানেক পরে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিশির দেখিল, তাহার কাকীমা অতি অবসন্ন হৃদয়ে ঘরের মেঝেয় জিনিসপত্র গুলি গুছাইয়া রাখিতেছেন। সে ডাকিয়া বলিল,— "কাকীমা, ও-বাড়ীর নীরদাকে একবার ডাক্‌লে হয় না?"

"ইন্দু একবার গিয়েছিল, কিন্তু কর্ত্তা তা'কে আস্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছেন।"

শিশির বিস্মিত হইয়া বলিল,—"সত্যি কাকীমা?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"কাকীমা, আমি একটা বড় অন্যায় করেছি।"

"কি অন্যায় করেছিস্ শিশির?"

"কাকার শ্রাদ্ধ,—বাবাকে ত একবারও জানানো হয়নি, অথচ তিনি ত সব বুঝ্‌তে পাচ্ছেন।"

পঙ্কজিনী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"সত্যিই ত! তুই কি মোটেই তাঁর কাছে যাস্ নি?"

"না কাকীমা।"

"বড় ভুল করেছিস্ শিশির, তুই এখনি একবার শীগ্‌গির যা। যদি দরকার হয়, আমাকেও যেতে হবে। তাঁকে বুঝিয়ে বলিস্, যেন আর তিনি আমাদের উপর রাগ না করেন; বিধবা বলিয়া যেন

ক্ষমা করেন।" শিশির একটা গভীর নিরাশার শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা বোধ হয় হবে না কাকীমা,—বাবার সেদিনকার ব্যবহার দেখে ত মনে হয় না যে, তিনি ক্ষমা করবেন। তবুও এক-বার যাই।"

নির্ম্মেঘোজ্জ্বল আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্য তখন মাথার উপর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। জীবনবাবু তখনও বাহিরের ঘরটাতেই বসিয়াছিলেন। শিশির শঙ্কিতপ্রাণে আসিয়া তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া জড়িতস্বরে ডাকিল,—"বাবা।"

এই মধুর সম্বোধন ক্ষণিকের জন্য যেন জীবনবাবুর প্রস্তর-কঠিন বুকটা একটু নরম করিয়া দিল। কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই আবার একটা হিংসার আগুনে যেন তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"শিশির, তুই এখানে—কি দরকার?"

মিনতিপূর্ণ চক্ষে পিতার দিকে তাকাইয়া বিনীতস্বরে শিশির বলিল,—"বাবা, ক্ষমা করুন। অতীত সব ভুলে যান।—কাল ইন্দুর বাপের শ্রাদ্ধ, আপনি দাঁড়িয়ে তাদের এ দায় হ'তে উদ্ধার ক'রে দিন্।"

তীব্রচক্ষে একবার শিশিরের দিকে তাকাইয়া কর্কশকণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন,—"লজ্জা করে না শিশির, আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এমনি ক'রে কথা কইতে? আমার শত সহস্র নিষেধ উপেক্ষা ক'রে, আমায় তোরা যতটা অপমান করেছিস্, আমি এইবার ততটা তা'র প্রতিশোধ নেব। ক্ষমা আমার বুকে নাই।—তুই দূর হ।"—বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। শিশিরের কাণের

কাছে মুক্ত বাতাসটা যেন নির্ম্মমতার কঠিন হাসি হাসিয়া শোঁ শোঁ করিয়া বহিয়া গেল। ব্যথিত হৃদয়কে কষ্টে সংযত করিয়া নম্র অথচ কোমল কণ্ঠে সে বলিল,—"বাবা, শাস্তি দিতে হয়, আমায় দিন্; কিন্তু বিপন্না-রমণীকে দায় হ'তে রক্ষা করুন।" জীবনবাবুর হৃদয় টলিল না, শিশিরের কথায় চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন, কর্কশ-বাক্যেই বলিলেন,—"দ্যাখ্ শিশির, তোর কাছে আমি উপদেশ কুড়াইতে আসি নাই। বেশী বাড়াবাড়ি করিস্ নে। একটা কুলটার সঙ্গে ঘনিষ্টতা কর্‌তে লজ্জা করে না? যতীনের স্ত্রী কুলটা। আমি স্পষ্ট ক'রে সবাইকে বোলে দিয়েছি—কেউ তা'র বাড়ীতে খেতে যাবে না, এটা স্থির জানিস্।" সহসা শিশিরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, প্রবল ভূকম্পনে পায়ের নীচের মৃত্তিকারাশি যেন সরিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ধিক্কারের বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে দৃঢ় অথচ উদ্ধতস্বরে বলিয়া উঠিল,—"বাবা, এত বড় একটা মিথ্যাকথা বল্‌তে, আপনার একটুও সঙ্কোচ বোধ হল না! সতীর শিরে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিতে আপনার একটুও দ্বিধা হোলো না! বাবা, ধর্ম্ম ব'লে একটা জিনিস যে জগতে এখনও আছে, সে যতই প্রচ্ছন্ন থাক্ না কেন, একদিন না একদিন তা'র স্বরূপ-মূর্ত্তি প্রকটিত হবেই হবে।"

ক্রোধে আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে, ক্ষতিচ্ছন্নের মত চীৎকার করিয়া জীবনবাবু, শিশিরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন; সহসা রতন আসিয়া বাধা দিয়া বলিল,—"করছেন কি বাবু—ছোট দাদাবাবু ত অন্যায় বলেন নি।" গভীর উত্তেজিত কণ্ঠে—"সরে

যা রতনা তুই,"—বলিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলেন। লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া শিশির, যন্ত্র-চালিতের মত এক পা এক পা বাড়াইয়া, তাহার কাকীমার সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কি সে পুণ্য-পবিত্রমূর্ত্তি! যেন একখানি যত্নে গড়া করুণা মাখানো দেবীপ্রতিমা কোন অভিশাপে এই হিংসা-পরিপূর্ণ ধরার বুকে পড়িয়া আছে। শিশির আত্মহারা হইয়া ডাকিল,—"কাকীমা—"

পঙ্কজিনী সস্নেহে শিশিরের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"শিশির, তোমার বাবা কি বল্লেন?" ভগ্নস্বরে শিশির উত্তর করিল,—"সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই কাকীমা, সে বড় কঠিন—সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।"

আগ্রহভরে শিশিরের হাত দুখানা টানিয়া বুকের উপর রাখিয়া, পঙ্কজিনী স্থিরকণ্ঠে বলিলেন,—"দেখেছিস্ শিশির, বুকটা কত শক্ত হয়ে গেছে। এখন যত কঠিনই হোক—এ বুকে সব সহ্য হবে;—তুই বল।" বিস্ময়-বিহ্বল নয়নে তাহার কাকীমার মুখের দিকে তাকাইয়া স্খলিত কণ্ঠে শিশির বলিল,—"কাকীমা, বাবা যে তোমার নামে একটা মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে—" অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া আর্ত্তকণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিয়া উঠিলেন, —"চুপ কর্, চুপ কর্, শিশির! আর বলিস্ নে,—আমি সব বুঝেছি।" নিবিড় দুঃখে, ক্ষোভে ও লজ্জায় পঙ্কজিনী মাথা নীচু করিলেন। একটু থামিয়া আঘাতটাকে একটু পরিপাক করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"ভগবান্! এ আবার তোমার কি নূতন প্রহেলিকা! রক্ষা কর দয়াময়, হৃদয়ে বল দাও।" অসহ্য মন-কষ্টে

মাটীতে লোটাইয়া পড়িলেন। শোকের প্রবল প্রবাহ অশ্রুরূপে গড়াইয়া ভূমিতল সিক্ত করিয়া তুলিল।

জননীর পাশে দাঁড়াইয়া ইন্দু টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতেছিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া, একটু শান্ত হইল। ধীরে ধীরে জননীর মস্তক একটু তুলিয়া ধরিয়া, স্নিগ্ধস্বরে ইন্দু বলিল,—"মা, ওঠো মা, এখনও যে অনেক বাকী। সব কান্নাগুলো নিঃশেষ ক'রে ফেলো না! কান্নাই যে এখন আমাদের একমাত্র সম্বল,—ফুরিয়ে গেলে আর কি নিয়ে থাকবো মা"—বলিয়া ইন্দু দুইহাতে মুখ ঢাকিল। তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বেদনাক্লিষ্টস্বরে শিশির বলিল,—"কাকীমা,—ইন্দু ঠিক বলেছে, তুমি ওঠো কাকীমা! পৃথিবীতে কতটা দুঃখ আছে—তা আমাদের পরীক্ষা করতে হ'বে।"

একটা প্রচণ্ড জ্বালার ভার বুকে লইয়া পঙ্কজিনী রুগ্নার মত উঠিয়া বসিলেন। সারা পৃথিবী আজ তাঁহার চক্ষে বড় বিস্বাদ ঠেকিতে লাগিল।

[১৬]

পরদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই, শিশিরের গাটা কেমন ছম্ ছম্ করিতেছিল। কয়দিনের খাটুনি, দুর্ব্বিষহ চিন্তা, তাহার সুখী শরীরকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। পঙ্কজিনী ঘরে ঢুকিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন,—"শিশির, ভট্‌চায্ মশায় কি আস্‌বেন ?"

শিশির লাফাইয়া উঠিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল,—"কেন কাকীমা, তিনি আস্‌বেন না ?"

"কি জানি বাবা।"

"আচ্ছা আমি দেখ্‌ছি। তাইত,আমার উঠ্‌তে আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে"—বলিয়া শিশির চোখ দুটোয় দুটো কড়া রকমের ডলা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তার মাঝখানে ভট্‌চায্ মশায়কে আসিতে দেখিয়া থামিয়া দাঁড়াইল। উৎসুক ভাবে বলিল,—"আমি যে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, ভট্‌চায্ মশায় !"

একটু চমকিত হইয়া তিনি বলিলেন,—"ও, আজ বুঝি যতীনের শ্রাদ্ধ ? তা—আমি ত, যেতে পার্‌বো না শিশির।—আর আমাদের গ্রামের কেউই যাবে না।"

গম্ভীর কণ্ঠে শিশির বলিল,—"কেন ?"

নাকে এক টিপ্ নস্য গুঁজিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ভট্‌চায্ মশায় বলিলেন,—"যতীনের বউটা নাকি, ভাল নয়।"

"কে আপনাকে ব'ল্লে ? এর কিছু প্রমাণ পেয়েছেন ?"

"এর আর প্রমাণের আবশ্যক কি শিশির? তোমার পিতা জীবন বাবু গ্রামের মধ্যে প্রধান লোক, আমরা তাঁকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করি। তিনি যখন স্বয়ং আমাদের একথা ব'লেছেন—তখন একথা ধ্রুবসত্য। আমরা যেতে পার্‌বো না। আর বিশেষতঃ তাঁর অমতে আমরা কিছুই ক'রতে পারি না"—বলিয়া হন্ হন্ করিয়া তিনি জীবন বাবুর বাটীর দিকেই অগ্রসর হইলেন।

পিতার এই ষড়যন্ত্রে শিশিরের বুকটার ভেতর একটা বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বিষদন্তহীন সর্পের মত তাহার নিষ্ফল গর্জ্জন ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া, কেবল অন্তরের ব্যথাই বাড়াইতে লাগিল। গ্রামের একটা সোজা রাস্তা ধরিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত সে কোথায় চলিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া শিশির ফিরিয়া আসিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিল,—"আমাদের বাড়ী কেউ আস্‌বে না কাকীমা,—এখন এঁকে দিয়ে কাজগুলো সেরে নাও।—কাকার শ্রাদ্ধে একজনও বামুন খাবে না"—বলিয়া ঘরের মেঝেটায় উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

পঙ্কজিনীর সমস্ত শরীরের তরল রক্ত-স্রোত যেন গাঢ় হইয়া মাথায় জমাট বাঁধিয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে, ধপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। সারা পৃথিবীটা যেন তাঁহার চক্ষে কেবল একটা ধোঁয়ার মত ঠেকিতে লাগিল। যন্ত্রণায় আকুল প্রাণে তিনি বলিলেন,—"ওঃ! এতদূর! নারায়ণ—রক্ষা কর"—বলিয়া ঊর্দ্ধে মুক্ত গগনের দিকে একবিন্দু করুণা পাইবার আশায় চাহিয়া রহিলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণ চেষ্টা করিয়া শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিয়া লইলেন। ঘণ্টা-দুই পরে পঙ্কজিনী অতিকষ্টে স্বামীর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া অবসাদগ্রস্ত দেহ মন লইয়া উদাস ভাবনায় ঘরের মেঝেটার উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র তখন পৃথিবীর বক্ষে তাণ্ডব নৃত্যে খাঁ খাঁ করিতেছে, উত্তপ্ত বায়ু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ধূলিকণা বহন করিয়া আনিয়া জানালার গরাদে ঠেকিয়া ছিট্‌কাইয়া যাইতেছিল। অস্বাভাবিক আরক্তনেত্রে শিশির আসিয়া পঙ্কজিনীর সম্মুখে দাঁড়াইল। কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"কি হবে কাকীমা,—একটীও যে বামুন খাবে না।"

পঙ্কজিনী করুণ নয়নে একবার শিশিরের দিকে তাকাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"ভেবে আর কি হবে বাবা,—এ সংসার গরীবের জন্য নয়।—গরীব আমরা, তাই আমাদের উপর এত অত্যাচার।—দুঃখ কোরো না শিশির,—এর চেয়েও অনেক সহ্য ক'রতে হ'বে। আর দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে,—যে জিনিস পত্রগুলো হ'য়েছে, তাইতে, বাইরে যে সমস্ত দুঃখী লোক এয়েছে, তাদের যত্ন ক'রে খাইয়ে দাও।" যন্ত্রণায় তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া আসিল, প্রবল অশ্রু অবাধ্য হইয়া চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইল, দুঃখাভিভূত অবসন্ন চিত্তে মেঝেয় লোটাইয়া পড়িলেন। শুষ্কমুখে অস্ফুটস্বরে শিশির বলিল,—"তবে তাইই করি।" গভীর অন্ধকারের মধ্যে যেন একটু আলো দেখিয়া শিশিরের হৃদয় আশার পুলকে জাগিয়া উঠিল। উৎসাহে বুকে বল বাঁধিয়া সমাগত আতুর দুঃখী ব্যক্তিদিগকে

সযত্নে আহার করাইতে লাগিল। সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা উচ্ছ্বসিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তাহাদের এই আশীর্ব্বাদ পঙ্কজিনীর অশান্ত-হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দিল। পুলকের উজ্জ্বল দীপ্তি শিশিরের চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, একটা হাঁপ ছাড়িয়া সে বলিল,—"যাক্, এক রকম সব শেষ হ'য়ে গেল।"

দিন দুই পরে সন্ধ্যার সময় শিশির তাহার কাকীমার নিকট গিয়া বলিল,—"কাকীমা,—কাল আমি মুঙ্গের যাবো, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে—দাদা ব'লে দিয়েছেন।"

পঙ্কজিনী একটু ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—"এখন ত যেতে পার্‌বো না, শিশির।"

বিস্মিত হইয়া শিশির জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন কাকীমা?"

"কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে কোথায় যাবো শিশির?—এখন আমি কোথাও যাবো না।—যদি এই মিথ্যেটা কখনো উল্টে দিয়ে প্রমাণ ক'রতে পারি, তবেই আবার কোথাও যাওয়া আসার কথা!—এখন এই ভিটেটাতেই পড়ে থাকি।"—একটা জ্বালার নিশ্বাস তাঁহার বক্ষস্থল হইতে আপনি বাহির হইয়া আসিল। দ্বৈধীভূত চিন্তায় অসহ্য হইয়া শিশির বলিল,—"আমার মনে হ'চ্ছে যে, তোমার মুঙ্গের যাওয়াই ভাল,—কাকীমা।"

দৃঢ়স্বরে পঙ্কজিনী বলিলেন,—"ওটা ভুল বুঝেছিস্ শিশির। এত বড় একটা অপবাদ মাথায় নিয়ে কলঙ্কিনীর মত কোথায় যাবো? না, না, তা আমি কখনও যেতে পার্‌ব না। দুষ্ট রাহুগ্রহ চন্দ্র-সূর্য্যকে

সময়ে সময়ে যে গ্রাস ক'রে ফেলে;—কিন্তু তাই ব'লে কি তাঁদের অনন্ত মহিমা একবারে লোপ পেয়ে যায়?—না, রাহুমুক্ত সূর্য্য যখন আবার আকাশে ওঠে, তখন তাঁর দীপ্ত-জ্যোতিঃ দেখে জগতের লোক করযোড়ে প্রণিপাত করে?"

একটা পবিত্র প্রভা তাঁহার চক্ষু হইতে নির্গত হইয়া শিশিরের মাথাটা ভক্তিভরে নোয়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া সহসা মাথাটা উঁচু করিয়া স্থির কণ্ঠে শিশির বলিল,—"ভেবে দেখ্‌লাম কাকীমা, তোমার না যাওয়াই উচিত।"

পঙ্কজিনী সস্নেহে শিশিরের মাথায় তাঁহার স্নেহ-শীতল হস্তখানি রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল না, মুঙ্গের সহরটায় যেন সন্ধ্যা হইতেই একটা প্রকাণ্ড কুয়াশা জাল পাতিয়া বসিয়াছিল। অনিল একখানা পুস্তক বুকে করিয়া বিছানার উপর পড়িয়াছিল, ঘরের মধ্যে একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুরবালা আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল,—"ঠাকুরপো আজও এল না কেন?—রাইপুরের কি তবে আর কারুর অসুখ বিসুখ হোলো?—কি জানি ভগবান্ কি ক'রবেন!—কাল যে ঠাকুরপোর আসবার কথা ছিল।"—

দূরে দূরে গাছগুলি কুয়াশার আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া ছিদ্রহীন সীমাহীন অন্ধকার মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গাঢ় স্তব্ধ রাত্রি সুরবালার মনের উপর স্তব্ধতা আনিয়া দিল। রাত্রি আট্‌টার সময় শিশির তাহাদের মুঙ্গেরের বাসায় আসিয়া, সুপরিচিত দ্বিতলের সিঁড়ী বাহিয়া অনিলের ঘরটার ভিতর ঢুকিল। পদশব্দে চমকিত হইয়া সুরবালা ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—"ও, তুমি এয়েছ,—এত দেরী হ'ল কেন?"

"গাড়ীখানা একটু দেরীতে এসেছে।"

তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া উদ্বিগ্নস্বরে অনিল জিজ্ঞাসা করিল,—"রাইপুরের সব ভাল ত?"

বিষণ্নস্বরে শিশির উত্তর করিল,—"ভাল নয়।"

উৎসুক নেত্রে শিশিরের দিকে তাকাইয়া ভীত কণ্ঠে অনিল বলিল,—"আবার কি হ'য়েছে শিশির?"

"বাবা জীবিত থাক্‌তে আর রাইপুরের ভাল খবর বোধ হয় কিছু পাবে না দাদা।"

সুরবালার প্রাণটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, অনিল সাগ্রহে শিশিরের হাতটা ধরিয়া টানিয়া তাহার নিকটে বসাইল। অদম্য উচ্ছ্বাসটাকে চাপা রাখিতে না পারিয়া শিশির বলিয়া উঠিল,—"বাবা, একটা ষড়যন্ত্র ক'রে গ্রামের একটী ব্রাহ্মণকেও আস্‌তে দেন নাই,—তাঁর সযত্ন চেষ্টায় শ্রাদ্ধের দিন একজন বামুনও পাতা পেতে খায় নি।"

"এর কারণ কি?—এখনও কি সেই হিংসেগুলো আছে।"

"তা বই আর কি,—'যতীনের বউটার চরিত্র দোষ আছে' ব'লে গ্রামশুদ্ধ তিনি রটিয়ে দিয়েছেন,—ঘরে ঘরে গিয়ে বারণ করে এসেছেন;—তা নইলে, যে একজন বিধবা বিপন্নাকে জব্দ করা হয় না দাদা;—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে না!"

কথাগুলা অনিলের কোমল সরল হৃদয়ে লাগিয়া অত্যন্ত আঘাত করিল। গুরুতর যাতনায় অতিষ্ঠ প্রাণে বলিয়া উঠিল,—"ওঃ! এতদূর! ছি, ছি, বাবা দিন দিন কি হ'য়ে যাচ্ছেন; যেন পিশাচের মত"—বলিয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

স্থিরোজ্জ্বল নয়নে শিশিরের দিকে তাকাইয়া সুরবালা বলিল,—"বাবার মনটা এত ছোট হয়ে গেছে 'ঠাকুরপো'? কাকা মারা গেলেন—কাকীমার এমন বিপদ—তবুও তাঁর একটু দয়া

হোলো না? উঃ! কি কঠিন।" অশ্রুভারাকুল নয়নে একবার সুর-বালা আকাশের পানে তাকাইল,—সে কি শান্ত, কি উদার! কিছু-ক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া সনিশ্বাসে বলিল,—"সব মানুষ যদি ঐ রকম হ'ত—ঐ আকাশের মত, তবে সংসারে এত দুঃখ থাকৃত না।"

[১৮]

ক্রমে একমাস দুইমাস করিয়া, যতীনবাবু মারা যাওয়ার পর ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। অনিল সম্পূর্ণ ভাবেই এই বিপন্ন সংসারটীর ভার মাথায় করিয়া বহন করিতেছে। পঙ্কজিনীর বিগত জীবনের একটা দুর্ব্বিষহ স্মৃতি ছাড়া সম্মুখে আর কোন অশান্তির ছায়া পড়ে নাই। সুখে দুঃখে দিনগুলো একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। সুদূর-প্রবাসী অনিল ও শিশিরের একান্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা, কোমল-প্রাণা বুদ্ধিমতী সুরবালার আগ্রহমাখা সান্ত্বনার ভাষা, তাঁহার তপ্ত হৃদয় অনেকটা শীতল করিয়া তুলিয়াছিল। সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যময় বৈধব্য-জীবনের মধ্যে কন্যা ইন্দুকে বুকে লইয়া, আশার ক্ষীণ আলো লক্ষ্য করিয়া, দিনগুলো অনেকটা শান্তিতে কাটাইয়া দিতেছিলেন। ভরা-বর্ষার মধ্যদিবসে পঙ্কজিনী একদিন ঘরের মেঝেয় বসিয়া মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব পাঠ করিতেছিলেন। ইন্দু, জননীর পাশে বসিয়া কি একটা সেলাই করিতেছিল; মাঝে মাঝে—"এইখানটায় কি রকম হবে মা?—এটা যে হ'চ্ছে না মা?" —বলিয়া পঙ্কজিনীর পাঠে ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল। তিনি একবার মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আপন মনে বলিলেন, "ওঃ, কি বৃষ্টি! আজই যেন পৃথিবীর শেষ হ'য়ে যেতে ব'সেছে।" —জানালাটার কাছে বসিয়া পঙ্কজিনী প্রকৃতির এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—"ইন্দু—আমার কাছে এসে ব'স।"

ইন্দু অল্প হাসিয়া বলিল,—"আমি ত তোমার কাছেই বসে আছি মা,—এখনও কি তোমার কোলে গিয়ে ব'সবো।" সহসা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইয়া পঙ্কজিনীর চোখে মুখে যেন ধাঁধা লাগাইয়া দিল। ত্রস্তে সেখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন। ইন্দু ব্যস্তভাবে বলিল,—"জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বসো মা, বাইরে যে রকম হ'চ্ছে।" পঙ্কজিনী ইন্দুর হাতটা ধরিয়া বলিলেন,—"ভয় কি মা,—ঠাকুরদের আজ খেলা হ'চ্ছে"—বলিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া বসিলেন। বাহিরে বাদলার বাতাস দিকে দিকে লুটোপুটী করিয়া বেড়াইতেছিল, বিন্দু বিন্দু বারি এক হইয়া স্বর্গে মর্ত্যে একাকার করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে ঝম্ ঝম্ শব্দে অশ্রান্ত বারিপতনের সঙ্গে চারিধারে ভেক ও ঝিল্লীর গম্ভীর শব্দ, অতিদূরে বনফুলের মধুর গন্ধ, আজ তাঁহার বিগত জীবনের একটা মধুর স্মৃতি টানিয়া আনিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"আগে এমনি ভাবে কত দিন তাঁর সঙ্গে বসিছি"—সহসা বাহির হইতে কে ডাকিল,—"ইন্দু।"

ইন্দু হাতের সেলাইটা ফেলিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল, আবার তখনি বিবর্ণকম্পিত মুখে ঘরে ঢুকিয়া জননীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"মা, ও-বাড়ীর কর্ত্তা এসে ডাকছেন,—উনি ত কখনও আসেন না,—আজ কেন এয়েছেন? ওঁর চোখ মুখ দেখে আমার কেমন ভয় হচ্ছে মা,—তুমি একবার চল।" পঙ্কজিনী সলজ্জ-সঙ্কোচে বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আপনার কি কিছু দরকার আছে?"

জীবনবাবু একটু থতমত খাইয়া জড়িত স্বরে বলিলেন,—"না, এমন কিছু দরকার নাই, তবে ও-পাড়া থেকে আস্‌ছিলাম—ভারি বৃষ্টি হ'চ্ছে, তাই তোমাদের একবার খবরটা নেবার জন্যে বাড়ীটায় ঢুক্‌লাম।"

জীবনবাবুর এই অযাচিত অনুগ্রহে পঙ্কজিনীর বুকটা কেমন শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। তখনও জীবনবাবু দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, ইন্দুকে একখানা আসন আনিতে ইঙ্গিত করিয়া, ভীত-স্বরে বলিলেন,—"দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চেন্ কেন,—রোয়াক্‌টায় উঠে বসুন।"

"আচ্ছা—বস্‌ছি"—বলিয়া জীবনবাবু আসনখানা টানিয়া লইয়া রোয়াকে উঠিয়া বসিলেন। তার পর সহসা পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া পঙ্কজিনীর সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,—"এই হাজার টাকার নোট আছে,—এইগুলো খরচপত্র কোরো,—আর তোমাদের কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না,—যা হবার তা হ'য়ে গেছে। তবে,—তুমি যদি আমায় একটু ভালবাস"—বলিয়া আগ্রহভরে পঙ্কজিনীর দিকে হাত দুইখানা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার সর্ব্ব-শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, পেছু হটিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"এত নীচ মনে ক'রেছেন, যে সামান্য অর্থের প্রলোভনে, একটা অমূল্য রত্ন আপনার কাছে বিলিয়ে দোবো? আপনার টাকা,—আমার পক্ষে বিষ। আপনি চ'লে যান।"

পঙ্কজিনীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া জীবনবাবু কলুষিত-বাসনার প্রবল তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া কম্পিত স্বরে—"একটু যদি, আমায় দয়া কর"—বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে ধরিবার জন্য এক পা অগ্রসর হইলেন।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া পঙ্কজিনী গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"সাবধান, আর এক পা এগুবেন না,—সতীর সতীত্ব জিনিসটা, ছেলেদের হাতের খেলাবার কাচের পুতুল নয় যে,—ইচ্ছে ক'রলেই সেটাকে ভেঙ্গে দিতে পারবেন। চলে যান্ আপনি। যদি না যান—তবে এখুনি গ্রাম শুদ্ধ লোক ডেকে আপনার এই কুকীর্ত্তি সকলের কাছে জানিয়ে দেব। ছি, ছি, লজ্জা করে না আপনার?—পরস্ত্রী যে মায়ের মত।"—বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। বহ্নির মত একটা তীব্র-জ্যোতিঃ তাঁহার নয়নকোণ হইতে বহির্গত হইয়া, জীবনবাবুকে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কম্পিত হস্তে নোটগুলা পকেটে পূরিয়া মূঢ়ের মত নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে জলে ভিজিতে ভিজিতে, চলিয়া গেলেন।

ইন্দু তাহার জননীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল,—"মা, আর এখানে থাক্‌বো না মা,—চল আমরা মুঙ্গেরে বৌদিদির কাছে যাই;—এখানে থাক্‌তে আমার কেমন ভয় হ'চ্ছে মা।"

কন্যাকে বুকে জড়াইয়া স্নেহ-পরিপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"ভয় কি মা? যিনি সংসারে পাঠিয়েছেন, তিনিই রক্ষা ক'রবেন।"

আবেগে তাঁহার চক্ষু দুইটী জলে পুরিয়া উঠিল। ভক্তিভরে অনন্ত মায়ের চরণে মাথাটা নোয়াইয়া কাতর প্রার্থনা করিলেন,—"প্রভু! অসহায়া আমি, রক্ষা কোরো ঠাকুর। স্বামীর স্মৃতি বুকে ক'রে যেন তোমার পায়ে দেহ মন সমর্পণ ক'রতে পারি।"

[১৯]

দিন-তিনেক পরে বড় অতিষ্ঠপ্রাণে পঙ্কজিনী, সুরবালাকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠিত অশান্ত মন একবার তাহাদিগকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের গুরুভারটা একটু কমাইয়া লইলেন।

"চিরায়ুষ্মতীষু—

বৌমা! তোমার পত্র মধ্যে মধ্যে পাই, শিশিরও পত্র দেয়। আজ সাত আট দিন হ'ল, তার আর কোন খবর পাই নি। মা, তোমরাই আমার একমাত্র সম্বল। বৌমা! আজ একটা খবর তোমায় দিলাম, মা,—তোমরা কতবার আমায় সাধ্যি সাধনা ক'রেছ—তখন যাইনি। মনে কেমন একটু দ্বিধা বোধ হ'ত—যাওয়া উচিত বিবেচনা ক'রতাম না। সে সঙ্কোচের কারণ তোমরা শুনেছ। কিন্তু উপস্থিত কোন ঘটনায়, আমার সে সঙ্কোচটুকু কেটে গেছে, এখন আমি তোমাদের কাছে যেতে পারি—হয়তো কোন দিন গিয়ে হাজির হ'ব। যে কারণে আমি তোমাদের কাছে যেতে পারিনি,—কতবার তোমাদের ব্যাকুল-আহ্বান প্রত্যাখান করেছি,—সে কারণ তোমাদের কাছে অবিদিত নাই। কিন্তু আজ আবার যে সূত্রে আমি তোমাদের নিকট যাইতে পারি বলিয়া লিখিতেছি—সেটা জানাইবার ইচ্ছা নাই। মন বড় উদ্বিগ্ন কিছুই ভাল লাগে না, এখন তোমাদের নিকট থাকিলেই বোধ হয় আমার

অনেক শান্তি। ইন্দু ভাল আছে, সে সর্ব্বদাই তোমার নাম করে তোমার কাছে থাক্‌তেই সে যেন ভালবাসে। অনিল কেমন আছে ? শিশিরের আর কোন খবর পেয়েছো কি না লিখো। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো ইতি—

তোমাদের অভাগিনী—

কাকীমা।”

দিন দুই পরে পঙ্কজিনীর পত্র সুরবালার হস্তগত হইল। আগ্রহভরে খামখানা ছিঁড়িয়া পত্র পড়িতে পড়িতে, তাহার মুখখানা কেমন ম্লান হইয়া গেল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আজ কাকীমার সহসা একি পরিবর্ত্তন!—আস্‌বার কথা হ’লেই তিনি কেবল নানা রকম কারণ দেখিয়ে বাধা দিতেন; পাছে আমরা আস্‌বার কথা লিখি,সেই আশঙ্কায় তিনি এ পর্য্যন্ত একটিও দুঃখের কথা আমাদের জানান নি। আমি অনেক সময় বুঝ্‌তে পার্‌তাম—বুঝ্‌তে পেরেও নীরব হয়ে থাক্‌তাম,—ভাব্‌তাম—জোর ক’রে ত তাঁকে আন্‌তে পার্‌বো না—তিনি যদি দয়া ক’রে আসেন, তবেই। কিন্তু আজ তাঁহার আসিবার ইচ্ছায়, আমার মনটায় ত বেশ আনন্দ পাচ্ছি না! অমঙ্গল ভাবনায় বুকটা যেন কেঁপে উঠ্‌ছে—তাঁর হৃদয় যে গভীর বেদনায় পূর্ণ,—পত্রের প্রতিভাষায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি। যাই হোক, তিনি বাড়ী আসুন তাঁকে একবার বলি।” সযত্নে পত্রখানা দেরাজের মাথায় রাখিয়া সুরবালা তখনি কাগজ কলম লইয়া পঙ্কজিনীকে পত্র লিখিতে বসিল।

"শ্রীচরণ-কমলেষু—

কাকীমা! আপনার পত্র পাইলাম, কিন্তু প্রাণে বেশ শান্তি পেলাম না। গৃহদাহে ভীত গাভীর মত কেবল রক্ত-রাঙ্গা মেঘ দেখিয়াই শঙ্কায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। মা,—আবার কি কোন নূতন বিপদের সূচনা হইয়াছে, না—দেবীর দ্বারের আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া সানন্দে তিনি মন্দির হইতে বাহির হইয়া সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছেন? বুঝিতে পারিলাম না, ব্যাপার কি। যাই হো'ক আপনার আসিবার ইচ্ছায় বড় সন্তুষ্ট হ'লাম। ঠাকুরপো শীঘ্রই রাইপুরে যাইয়া আপনাদের লইয়া আসিবে।

ইন্দুকে কতদিন দেখিনি—তার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়—তার সেই হাসি-মাখা মুখ—'বৌদি' বলিয়া ডাক—কল্পনায়ও যেন প্রাণে শান্তি ঢালিয়া দেয়—ইচ্ছা করে ছুটিয়া গিয়া একবার তাহাকে নিবিড় বাহু-বেষ্টনীর মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরি। কিন্তু কি ক'রবো মা, উপায় নাই—নিরুপায়ে প'ড়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকি। স্ত্রীজাতি আমরা ইচ্ছে হ'লেই কোন কাজ ক'রতে পারি না।

এখানে আপনার ছেলে ভাল আছেন, ঠাকুরপোর খবর পেয়েছি ভাল আছে। আমার কথা আর কি জানাবো মা,—যার মায়ের প্রাণে অত ব্যথা—সে মেয়ের বুকে আর কতটা শান্তি থাক্‌তে পারে! আর কিছু লিখিবার নাই। ইন্দুকে আমার

আশীর্ব্বাদ দিবেন, আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। বিদায় ইতি—

আপনার স্নেহের
বৌমা।"

অনিল বাসায় আসিয়া পা দিতেই, সুরবালা ব্যস্তভাবে স্বামীর নিকট গিয়া জানাইল,—"ওগো কাকীমা আজ চিঠি দিয়েছেন, তিনি এখানে আস্‌বেন।"

সপ্রেম দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে তাকাইয়া অনিল বলিল,—"বেশ ত।"

সহসা মুখখানা মলিন করিয়া সুরবালা বলিল,—"না,—বড় বেশ নয়।"

বিস্ময় সহকারে অনিল জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

"আমার মনে হয়, এমন একটা কিছু হ'য়েছে—যাতে তিনি সেই তীর্থের মত পবিত্র স্বামীর ভিটেটুকু ছেড়ে এখানে আস্‌তে চেয়েছেন"—বলিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রবোধ-বাক্যে অনিল বলিল,—"না, না, কিছু হয়নি—এতদিন তাঁর মন ভাল ছিল না—ইচ্ছে হয়নি, তাই আসেন নি ;—এখন তাঁর আস্‌বার ইচ্ছে হয়েছে, তাই লিখেছেন যে আস্‌বো।"

সুরবালা একটা ছোট্ট শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"না, অত সোজা নয়, আমি যে তাঁকে খুব চিনি। যাই হো'ক, তুমি তাঁকে এখন নিয়ে আস্‌বার জন্যে ঠাকুরপোকে একখানা চিঠি লিখে দাও।"

"আচ্ছা কালই শিশিরকে চিঠি লিখ্‌বো।"

"তবে তাহাই দিও। এখন তুমি জামা কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল—আমি ততক্ষণ ও-ঘর থেকে তোমার খাবার নিয়ে আসি"—বলিয়া সুরবালা চলিয়া গেল।

অনিল স্থিরোজ্জ্বল নয়নে পত্নীর দিকে তাকাইয়া আপন মনে বলিল,—"সুরবালা সত্যই স্ত্রীরত্ন—যেন একখানি ত্রিদিবের ছবি, অভিশাপে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে।"

[২০]

জীবন বাবুর যেন একটা আকস্মিক বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটিল, পঙ্কজিনীর সেদিনকার সেই তেজোগর্ভ বাক্যগুলি যেন সবলে নিক্ষিপ্ত শরের মত—তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল। হৃদয়ের তীব্র জ্বালা উপশমের আশায় একটু শান্ত শীতল আশ্রয়ের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নির্ম্মল, অনাবিল, মুক্ত স্নেহ, মাতৃত্বের গৌরবেই গৌরবান্বিত; বিধবা পঙ্কজিনীর চরণ-তলে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিবার জন্য তাঁহার অনুতপ্ত হৃদয় বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা তাঁহার এই ইচ্ছাটার বিরুদ্ধে বাধা দিয়া, বড় নির্ম্মমের মত তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। আলোর চেয়ে আঁধারটাই যেন তাঁহার চক্ষে অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দিনরাত ঘরের দোর জানালা বন্ধ করিয়া,বায়ু-শূন্য রুদ্ধ গৃহের অন্ধকারটার ভিতর পড়িয়া দিনগুলা কাটাইতে লাগিলেন। তোষামোদে তৃপ্ত করিয়া কিছু পাইবার প্রত্যাশায়, কতলোক আসিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ ডাকা-ডাকি করিত ;—রতন বুদ্ধি খাটাইয়া বলিয়া দিত,—"বাবুর অসুখ হ'য়েছে, তিনি বাইরে আস্‌বেন না, কারুর সঙ্গে দেখা ক'রবেন না।"—আশায় নিস্ফল হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে শূন্য হৃদয়ে তাহারা সকলে ফিরিয়া যাইত। ক্রমে সকলেই জানিল যে, জীবন বাবুর একটা বড় রকমের অসুখ হইয়াছে, তিনি আর বাহিরে বসেন না—এমন কি কারুর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্তও করেন না। এই ভাবেই কয় দিন

কাটিয়া গেল। সুখ কিম্বা দুঃখ একঘেয়ে কোন জিনিসই মানবের প্রাণে তৃপ্তি আনিতে পারে না,—দিনরাত অন্ধকার ঘরটায় পড়িয়া বাহিরের একটু আলো দেখিবার জন্য জীবন বাবুর হৃদয় বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল; কয়দিন পরে সভয়ে জানালাটা খুলিয়া একবার বাহিরের দিকে তাকাইলেন। আঁধারের পর আলোটা তাঁহার চক্ষে অতি মধুর বোধ হইতে লাগিল। উৎসুক নেত্রে একবার ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিলেন,—বর্ষার ঘন গম্ভীর জল-পোরা মেঘের নীচে উন্নতশীর্ষ নারিকেল, তাল, ঝাউ, দেবদারু বৃক্ষরাজি যেন তাঁহার দিকে উপহাসের হাসি হাসিয়া গর্ব্বভরে মাথা দোলাইতেছে। জীবন বাবু আপন মনে প্রশ্ন করিলেন,—"এই গাছগুলা কি চিরকাল এমনি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে?" পশ্চাৎ হইতে বিবেক আসিয়া যেন দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর করিল,—"যদি কারও অনিষ্ট না করে—অত্যাচার না করে, তবে চিরকাল ঐ ভাবেই থাক্‌বে।" দৈববাণীর মত কথাগুলা জীবন বাবুর কাণের ভিতর দিয়া হৃদয়ের পরতে পরতে গিয়া বাজিল। বাইরের আলো তাঁহার চক্ষে আর ভাল লাগিল না। অতিষ্ঠ প্রাণে জানালাটা বন্ধ করিয়া গৃহের গাঢ় তমসার মধ্যে আবার ডুবিয়া গেলেন। চিন্তাকুল প্রাণে একবার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, যেন গভীর আঁধার,—যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই আঁধার—সীমাহীন অন্ধকার তাঁহাকে পথহারা করিবার জন্য কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভীত প্রাণে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা খুলিয়া ডাকিলেন,—"রতন, কোথা তুই।"

প্রভুর আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়া বিনীত স্বরে রতন বলিল,—"বাবু"। জীবন বাবুর আর ঠোঁট নড়িল না,—মৌন নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া, তিনি রতনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বাবুর অকস্মাৎ এই পরিবর্ত্তনে রতন একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। কয়দিন হইতেই সে মনে মনে অনেক তোলাপাড়া করিয়াছে, কিন্তু তথ্য অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। যাই হোক, মনিবের এই অবস্থায় সে অত্যন্ত দুঃখিত ;—তাই সে কাতর প্রাণে জীবন বাবুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"বাবু, আপনার শরীর ভারি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, একজন ভাল ডাক্তার দেখান।"

জীবন বাবু বিরক্ত ভাবে মুখটা ফিরাইয়া বলিলেন,—"যা ব্যাটা তুই, তোকে আর পরামর্শ দিতে হবে না—ডাক্তারের বাবারও সাধ্যি নেই—যে আমার এ অসুখ সারাতে পারে।" বলিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বিছানাটায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। রতন হতভম্বের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। বাহিরে আসিবামাত্র নীরদা—বাবুর কি হইয়াছে জানিবার জন্য উৎসুক ভাবে বলিল,—"বাবুর কি হয়েছে রে রতন ?"

রতন মুখখানা শুষ্ক করিয়া বলিল,—"কি জানি, কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।"

নীরদা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া—"কি জানি, সেটাত আমিও জানি—তবে আর তোকে জিজ্ঞেসা ক'রবো কেন ?"—বলি, উঠানটা ঝাঁট দিতে লাগিল।

ক্রমে জলদ-জাল-সমাচ্ছন্ন আকাশের বুক হইতে পাতালের অন্ধকার সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। নীরদাই এখন এ বাড়ীর গৃহিণী। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া,সে জীবন বাবু যে ঘরটায় শুইয়া আছেন, সেখানেও একটা আলো দিয়া আসিল। উত্তেজিত কণ্ঠে জীবন বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"কে আমার ঘরে আলো দিলে —আলো নিবিয়ে দে এখুনি।"

নীরদা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া তাড়াতাড়ি আলোটা নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। জীবন বাবু কতকটা যেন স্বস্তি বোধ করিলেন—অন্ধকারই যেন প্রিয়। দারুণ মনোবেদনায় পীড়িত হইয়া সেই অন্ধকার গৃহে নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই আজ কয়দিন হইতে পড়িয়া আছেন—নির্জ্জনতাই যেন তাঁহার বাঞ্ছনীয়। তাঁহার অজ্ঞাতে মাঝে মাঝে কেবল রতন আসিয়া তাঁহার খোঁজ লইয়া যাইত—সেটাও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। দুর্ব্বিষহ চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিদণ্ডে, প্রতি পলে পলে, পঙ্কজিনীর সেই ভ্রূকুটীপূর্ণ ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখখানা তাঁহার প্রাণে বড় আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিতেছিল। বিচারের দেশ হইতে শাস্তি স্বরূপ জ্বলন্ত-বহ্নি যেন লক্ষজিহ্বা বিস্তার করিয়া এককালে তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। শঙ্কিত প্রাণে উন্মত্তের ন্যায় যেন কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমায় পুড়িয়ো না,—আমায় পুড়িয়ো না।" ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি কি পাগল হ'য়ে গেলাম!"—মাথাটা বড় গরম বোধ হইতে লাগিল,তাড়াতাড়ি

মাথার গোড়ার জানালাটা খুলিয়া দিলেন। বাহিরের উন্মুক্ত শীতল বাতাসে একটু সুস্থ হইয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রাদেবী যেন আজ বড় দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার শীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

ভোরের বেলায় ঘুম ভাঙ্গিতেই জানালাটা খোলা আছে দেখিয়া বন্ধ করিবার জন্য জীবন বাবু একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন,—উঠিতে পারিলেন না। সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর বেদনা, মাথাটা অত্যন্ত ভার,বুকটায় ভারি ব্যথা। নিশ্চেষ্ট ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন, কাহাকেও ডাকিলেন না। প্রত্যূষে রতন আসিয়া "বাবু,—তামাক সেজে এনেছি উঠুন"—বলিয়া ডাক দিল; কোন সাড়া শব্দ নাই। রতন দুই তিন বার ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। ভয়ে রতনের মুখখানা শুকাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি জীবন বাবুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিল, তিনি চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, অল্প অল্প চোখের পাতা নড়িতেছে। ভয়ে ভয়ে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া একবারে চম্‌কাইয়া উঠিল, আপন মনে বলিল;—"এ যে ভারি জ্বর হ'য়েছে—গায়ে হাত দেওয়া যায় না।" কাহাকেও কিছু না বলিয়া রতন ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। জীবন বাবু তখন সংজ্ঞাশূন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই রোগটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার তাঁহাকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিয়া গেলেন,—"অবস্থা ভাল নয় রতন, শ্লেষ্মা বুকে পিঠে যে রকম ছড়িয়ে পড়েছে—বাঁচেন কি না সন্দেহ। তুই মুঙ্গেরে অনিলকে

খবর দে,—আর আগুন ক'রে সেক দেবার ব্যবস্থা কর। আমি একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেইটে একঘণ্টা অন্তর খাওয়া। আমি এখন চ'ল্লাম, দরকার হ'লে ডাকিস্।”

রতন একলা এতগুলা কাজ কি করিয়া করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। এত বড় বিপদের মাঝে এরূপ একলা সে কখনও পড়ে নাই। নীরদাকে আসিতে দেখিয়া তাহার একটু সাহস হইল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহার কাণে কাণে জানাইল,—“বাবুর ভারি অসুখ,—ডাক্তার এসে বলে গেল বাচেন কি—না। এখন কি করি বল দেখি?” অকস্মাৎ বাবুর অত্যন্ত অসুখ শুনিয়া নীরদার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে রতনের দিকে চাহিয়া বলিল,—“তা, একবার ও-বাড়ীর বৌঠাক্রুণকে ডাক্‌লে হয় না? তাঁরা ভদ্দর লোকের মেয়ে, তাঁদের মাথায় অনেক বুদ্ধি আছে। কত্তার অসুখ হ'য়েছে শুন্‌লে—তিনি না এসে থাক্‌তে পারবেন না।—তুই একবার যা, তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়। না হয় আমিই যাই।”

রতন, নীরদার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলিল,—“তুই বেশ ব'লেছিস্, ও-বাড়ীর মাঠাক্রুণকে ডেকে নিয়ে আসি, তিনি যা হয় করুন। তিনি আমাদের যা ক'রতে বল্‌বেন, আমরা তাই করবো” —বলিয়া ছুটিয়া ইন্দুদের বাড়ী আসিয়া ডাকিল,—“ইন্দু—দিদি। মা, কোথায় মা তুমি।”

কতদিন পরে রতনকে দেখিয়া স্নেহসূচক স্বরে পঙ্কজিনী বলিলেন,—“কিরে রতন?”

বড় ব্যস্ত ভাবে রতন বলিল,—"মা, কর্ত্তার বড্ড অসুখ—ডাক্তার এসে বলে গেল—বাঁচেন কি না সন্দেহ। তোমায় যেতে হবে মা। বাড়ীতে কেবল আমরা আছি—কিছু ঠিক ক'রতে পাচ্ছিনে; তুমি চল মা—তুমি না গেলে হয় ত তিনি বিনাযত্নে মারা যাবেন।—আমরা কি তেমন পার্‌বো মা।"

রতনের কথার কোন জবাব না দিয়া পঙ্কজিনী কিছুক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"সত্যিই কি, আমি না গেলে তিনি বিনাযত্নে মারা যাবেন?—তা যদি হয়, তা হ'লে আমি যাবো—আমার যাওয়া উচিত। তিনি আমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুন না, এ সময় সে কথা মনে ক'রে থাকা যায় না। বিশেষতঃ আমরা নারী জাতি, নারীর ধর্ম্ম আমাদের পালন করা উচিত—রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকে সান্ত্বনা, দেবার জন্যই যে আমাদের জন্ম।" রতন অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিল,—"কি হবে মা?"

স্থির কণ্ঠে পঙ্কজিনী উত্তর করিলেন,—"হবে আর কি রতন, চল আমি যাচ্ছি।" বলিয়া বাড়ীর দু-একটি কাজ সারিয়া রতনের সহিতই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একটা হাঁপ ছাড়িয়া রতন বলিল,—"বাঁচ্‌লাম মা।"

এই কয় দিনের মধ্যেই শিশিরের পিতার দেহের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া পঙ্কজিনী বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুর করাল-ছায়াচ্ছন্ন বৃদ্ধ জীবন বাবুর দিকে তাকাইয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়া পড়িল! ঘরে ঢুকিতেই নীরদা গলায় কাপড় দিয়া তাঁহা...

পায়ের গোড়ায় মাথাটা ঠুকিয়া বলিল,—"এই যে,—বৌঠাকরুণ এয়েছেন।"

জীবন বাবু এতক্ষণ কেমন একটা মোহের ঘোরে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, নীরদার কথায় সহসা চমকিত হইয়া জোর করিয়া চক্ষু মেলিয়া, একবার গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া, পঙ্কজিনীকে দেখিয়া আকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"মা—মা, তুমি এয়েছ—এত দয়া তোমার, সন্তানের অসুখ শুনে ছুটে এয়েছ!—মা, আমায় ক্ষমা কর—অপরাধী আমি—পাপী আমি—আমায় ক্ষমা কর।"—বলিয়া অসাড় ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। অনুতাপের অশ্রু হৃদয়ের পঙ্কিলতা ধৌত করিয়া অজস্র ধারায় দুই চক্ষু বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আবার ডাকিলেন,—"মা—মা, কোথায় মা।"

পঙ্কজিনী অতীত স্মৃতিটাকে দূরে সরাইয়া দিয়া, নূতন জীবনের অধ্যায়টাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য হৃদয়ের অদম্য আবেগে আকুল ভাবে ছুটিয়া জীবন বাবুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া স্নেহ-ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন,—"বাবা, এত অসুখ হ'য়েছে, আর আমায় খবর দেন নি? ভাগ্যি রতন ডেকে আনলে।"

মুদিত নেত্রে ক্ষীণ কণ্ঠে জীবন বাবু উত্তর করিলেন,—"অসুখ কাল রাত থেকে হয়েছে—খবর দেবার সময় পাই নি মা। মা—সন্তানকে রক্ষা কর মা,—বুকে বড় ব্যাথা! ওঃ আমি কি করেছিলাম!—মা-মা, আমায় হত্যা করো মা—কুপুত্রের মুখ দেখো না—উঃ! মা—কি যন্ত্রণা!" সহসা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মাথায়

পাখার বাতাস ও জল-সিঞ্চন করিতে করিতে, স্নেহ-কোমল কণ্ঠে পঙ্কজিনী ডাকিলেন "বাবা—বাবা।"

চক্ষু দুইটী উপর দিকে তুলিয়া জড়িত স্বরে জীবন বাবু বলিলেন,—"কে ?—মা—তুমি ?—তাই হাতগুলো এত নরম—যেন স্নেহে গ'লে প'ড়ছে। মা,—চলে যাস্‌নে মা,—কুসন্তান ব'লে ফেলে চলে যাস্‌নে মা—শেষ কালটায় যেন মায়ের কোলে মাথা রেখে যেতে পারি।"

দয়ায় পঙ্কজিনীর হৃদয় গলিয়া গেল। মূর্ত্তিমতী আশার মত জীবনবাবুর সম্মুখে বসিয়া সান্ত্বনা সূচক স্বরে বলিলেন,—"বাবা, কতকগুলো বাজে কথা মনে ক'রে কেন কষ্ট পাচ্ছেন—সে সব কথা ভুলে যান। বর্ত্তমানের সুখটা মনে করুন,—আমি আপনার—মা, আর আপনি সন্তান।"

মানসিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া জীবন বাবু শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। বিকৃত স্বরে বলিলেন,—"আমায় ক্ষমা ক'রেছিস্ মা ? তবে দে-মা আমায় তোর ওই পায়ের ধূলো দে,—আমি পবিত্র হয়ে যাই। তীর্থের মাটীর মত তোর ঐ পায়ের ধূলো মেখে, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিই। দে—মা, আমায় তোর পায়ের ধুলো —দে।" পঙ্কজিনী জোর করিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন; অশ্রুপূর্ণ চক্ষে অনুতপ্ত জীবন বাবুর দিকে তাকাইয়া ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—"বাবা—অমন করবেন না, স্থির হয়ে ঘুমুন।"

"তবে তাই ঘুমুই মা, মায়ের কথার আর অবাধ্য হবো না"

বলিয়া শান্ত শিষ্ট শিশুর মত আর কোন ওজর আপত্তি না করিয়া শুইয়া রহিলেন। প্রাণের ভিতর যেন বিমল শান্তিবারি তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা সব ধৌত করিয়া দিল।

পঙ্কজিনী যেমন স্বভাব-সিদ্ধ অভ্যাসগুণে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অক্লান্ত ভাবে রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ভয় হইল। খানিকক্ষণ পরে রতনকে ডাকিয়া বলিলেন "রতন—তুই এক্ষুণি মুঙ্গেরে একখানা টেলিগ্রাম করে দিয়ে আয়। অনিল, বৌমা, শিশির, তারা সব আসুক—অসুখ বড্ড বেশী, শেষ কালে কি তাদের সঙ্গে দেখা হবে না?" দীন-ভীত-নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রতন বলিল,—"যাচ্ছি মা,—তুমি যখন বলেছ, আর দেরী ক'রবো না।"

অনেকক্ষণ পরে রোগী চক্ষু মেলিয়া একটা কষ্টের শ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তুমি আছ ত মা?"

"এই যে বাবা,—আমি এইখানে বসে আছি—মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?"

"না-মা, চোখে আর ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—সব যেন ঝাপ্‌সা ঠেক্‌ছে। মা—এক কাজ কর মা, মুঙ্গেরে অনিলকে খবর দাও, তারা সব আসুক। শিশির, বৌমা আসুক—শেষ কালটায় একটু সুখ ক'রে নিই—কিন্তু আর সময় নেই, সময় বড় কম হ'য়ে গেছে—মা। যাই হো'ক যতটা সময় পাই—এত খানি সুখের আশা ছাড়্‌তে পাচ্ছি না মা,—তুমি শীগ্‌গির তাদের টেলিগ্রাম করে দাও।"

"রতনকে টেলিগ্রাম ক'রবার জন্যে পাঠিয়েছি বাবা।"

"বেশ ক'রেছ মা,—উঃ—কি ভুলই ক'রেছিলাম"—বলিয়া পাশ ফিরিলেন। যন্ত্রণার অশ্রু অবিরল ধারায় নির্গত হইয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল।

ক্ষণিক চেতন অবস্থায় আবার ক্ষণিক অচেতন অবস্থায় থাকিয়া জীবন বাবু বিকারের ঘোরে কেবল "মা—মা"—বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

পবিত্র মাতৃ-আহ্বানে পঙ্কজিনীর কোমল হৃদয় স্নেহের উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিল। সন্তানের স্নেহে বৃদ্ধ জীবন বাবুর মস্তক কোলে লইয়া অশ্রান্ত ভাবে সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়, জীবন বাবুর কালপূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাকে যাইতে হইবে। পঙ্কজিনীর শত চেষ্টা, যত্ন সব ব্যর্থ হইতে লাগিল, ক্রমে রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। বৈকালে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল,—"এ যাত্রা আর রক্ষা নাই।"

পঙ্কজিনী আকুল প্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। ইন্দু বৈকাল হইতে তার মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতেছিল। ক্রমে ক্রমঃক্ষিন্ন দিনের আলোটা পড়িয়া আসিল, —নীরদা ঘরে ঘরে, সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল।

পঙ্কজিনী যুক্তকরে ডাকিলেন,—"ঠাকুর, আজকের রাতটা ভালয় ভালয়, কাটিয়ে দিও—কাল যেন তারা এসে দেখ্‌তে পায়।"

মধ্য রাত্রে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল,—মুহুর্মুহু শ্বাস নির্গত হইতে লাগিল, বুকে পিঠে অস্বাভাবিক বেদনায় কাতর

হইয়া নিতান্ত শিশুর মত কাঁদিয়া বৃদ্ধ জীবন বাবু কেবলই—"মা—মা,"—বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পঙ্কজিনী কখন রোগীর মুখে ওষুধ দিতেছেন, আবার বুকে পিঠে সেক দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, মাথায় বাতাস দিতেছেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। রতন, নীরদা, কেবল তাঁহারই আজ্ঞামত আবশ্যক জিনিসপত্র আনিবার জন্য ছুটাছুটী করিতেছে। নানাবিধ উপসর্গের সহিত রাতটা কাটিয়া গেল। ভোরের বেলায় রোগী একটু শান্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বেলা দশটার সময় মুঙ্গের হইতে অনিলরা সব আসিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দু আনন্দে ছুটিয়া গিয়া তাহার বৌদিদির পাশে গিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু এখন সে বড় হইয়াছে—কাজেই আগেকার মত একবারে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিতে কেমন একটু বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। উৎফুল্ল-নয়নে সুরবালার মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিল,—"বৌদি'।"

আগ্রহভরে ইন্দুর মুখে চুমু খাইয়া সুরবালা বলিল,—"ইন্দু, বোন্‌টী আমার, আয় এখন,—বাবা কেমন আছেন দেখিগে।"—বলিয়া জীবন বাবু যে ঘরটায় শুইয়াছিলেন, সেই ঘরটায় প্রবেশ করিল।

অনিল, তাহার রুগ্ন পিতার পার্শ্বে স্নেহশীলা কাকীমাকে দেখিয়া আনন্দিত হৃদয়ে বলিল,—"কাকীমা তুমি এসেছ!"—বলিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। শিশির আসিয়া ডাকিল,—"কাকীমা ?"

পঙ্কজিনী তাহাদের উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন, সুরবালা আসিয়া পঙ্কজিনীর পায়ের ধূলা লইতেই আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল,—"মাগো—মা, তোমার দশা দেখে বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে কাকীমা?"

পঙ্কজিনী আঁচলের খুঁটে চোখটা মুছিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"চুপ কর মা,—চুপ কর। তোমার শ্বশুর ও-রকম ক'চ্ছেন কেন একবার দেখগে,—বোধ হয় আর বেশী সময় নেই। আহা! তোমাদের জন্যই যেন অতি কষ্টে প্রাণটাকে ধরে রেখে দিয়েছেন।"

সুরবালা ছুটিয়া গিয়া শ্বশুরের পায়ের তলায় বসিয়া ক্রন্দন-কম্পিত স্বরে ডাকিল,—"বাবা।"

অতি কষ্টে চোখ চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে জীবন বাবু বলিলেন,—"কে—ও—বৌমা?—তোমরা এয়েছ? শিশির কই—অনিল কোথায়?"

"এই যে বাবা, আমরা আপনার মাথার গোড়ায় বসে আছি। বাবা—বাবা"—বলিয়া কাঁদিয়া শিশির কক্ষটাকে কাঁপাইয়া তুলিল; অনিল একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিল,—"শিশির, কাঁদিস্‌নে এখন—চুপ কর, বাবার কষ্ট হবে।"

পঙ্কজিনী ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন,—"অনিল, তুই একবার হাতটা দেখে এই ঔষুধটা ওঁকে খাইয়ে দে; ডাক্তার দিয়ে গেছে—ধাত গরম রাখার জন্যে।"

অনিল কম্পিত হস্তে তাহার কাকীমার হস্ত হইতে ঔষধটা

লইয়া পিতার মুখে ঢালিয়া দিল। মিনিট-তিনেক পরে মৃদুস্বরে জীবন বাবু বলিলেন,—"আর আমায় ওষুধ দিস্‌নে অনিল,—যদি ভাল হই, তবে এতেই হ'বো—তোদের দেখেই ভাল হ'ব।"

অনিলের হাতটা টানিয়া বুকের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ;—"অনিল—বাবা, রাগ করিস্‌নে আর ;—আমায় তোরা সবাই ক্ষমা কর। বৌমা,—মনে কিছু করিস্‌নে-মা। শিশির—তুই সব ভুলে যা বাবা। আমার মা—কোথায় তুমি —মা"—বলিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিলেন। পঙ্কজিনী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"এই যে বাবা,—আমি।"

"মা, তোমার হাতে এদের সব দিয়ে গেলাম মা,—এদের তুমি দেখো"—বলিয়া মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইলেন।

"অনিল আর আমার বেশী সময় নেই, এখুনি যেতে হবে ; কিন্তু জীবনে একটা বড় সাধ আছে—সেইটে পূর্ণ হ'লেই—আমার সুখের মৃত্যু হয়।"

সাগ্রহে মুমূর্ষু পিতার দিকে চাহিয়া অনিল বলিল,—"বলুন বাবা,—আপনার মনের সাধ কি ?"

মানসিক উত্তেজনায় ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তোরা সব আমায় ঘিরে দাঁড়া, বৌমা—তুমি আমার পায়ের তলায় দাঁড়াও। অনিল—তুই ঐ বৌমার পাশে গিয়ে দাঁড়া। আর মা,—তুমি আমার এই পাশে থাক"—বলিয়া পঙ্কজিনীকে তাঁহার পাশে থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। তারপর

বৃদ্ধ মুমূর্ষু জীবন বাবু করযোড়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন,—
"যতীন—ভাই আমায় ক্ষমা কর"—সহসা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া
ডাকিলেন,—"ইন্দু, মা আমার, আমার কাছে এস মা।" ভয়ে
জড়সড় হইয়া ইন্দু তাঁহার অতি নিকটে গিয়া বসিল। "তোর বাঁ
হাতটা দে'ত মা"—ইন্দু কম্পিত প্রাণে তাহার ক্ষুদ্র কোমল হাত
খানি বাড়াইয়া দিল, তার পর অপর দিক হইতে শিশিরের হাতটা
ধরিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন,—"শিশির, এই ইন্দুর সঙ্গে
তোর বিয়ে দিয়ে গেলাম। বড় বৌমা এঁকে তোমার ছোট বোনের
মত দেখো।—আর আমার সময় নেই বৌমা,—তুমি আমার ছোট
বৌমাকে শিশিরের পাশে দাঁড় করিয়ে দাও—আমি একবার
দেখি।"

"দিই বাবা"—বলিয়া আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে সুরবালা বড় যত্নে
ইন্দুকে কোলে লইয়া শিশিরের পাশে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

স্বামীর শেষ আশা এতদিনে পূর্ণ হইল। ইন্দু যে সত্যই শিশিরের
হইল দেখিয়া পঙ্কজিনী আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন; আনন্দাশ্রু
বাধা না মানিয়া চক্ষু বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষণপরে মুমূর্ষু তাহার রুগ্ন ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ-হাসি হাসিয়া পঙ্ক-
জিনীকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "মা, বড় ভুল ক'রে এক-
দিন একটা কুকথা বলেছিলাম; কিন্তু সে কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা,
তা আজ আমি আমার শিশিরের হাতে ইন্দুকে দিয়ে স্বীকার ক'রে
গেলাম। আর আমার বলবার কিছু নেই। দেখ ত মা, কেমন
মানিয়েছে—যেন দুটী জোড় মাণিক—আমার আঁধার ঘরে—আজ

যেন আলো ফুটে উঠেছে। মা, আমার পথটা বড় অন্ধকার হয়ে উঠেছিল—ক্ষমা করো ; যাই মা। আমার আঁধার পথের জন্য তোর একটু "পুণ্যের আলো" দে-মা, সঙ্গে নিয়ে যাই। আঃ! বড় শান্তি—যাই মা—অনিল—বৌমা।" তখনও মুমূর্ষুর মুখ হইতে অতি অস্ফুট স্বরে শুনা যাইতেছিল "ঐ আমার "পুণ্যের আলো"। তার পর একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সঙ্গে সব শেষ হইয়া গেল।